১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা এপ্রিল-জুন-২০০৫
ইসলামী আইন ও বিচার
ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ এর ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা
ইসলামী আইন ও বিচার

ISSN 1813 - 0372

ইসলামী আইন ও বিচার

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ

Islami Ain O' Bichar

ইসলামী আইন ও বিচার

১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা

প্রকাশনায়: ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ -এর পক্ষে
এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম

প্রকাশ কাল : এপ্রিল-জুন, ২০০৫

যোগাযোগ : সমন্বয়কারী
এস এম আবদুল্লাহ
ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ
পিসি কালচার ভবন (৪র্থ তলা)
১৪, শ্যামলী, শ্যামলী বাসষ্ট্যান্ড, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১৩১৭০৫, মোবাইল : ০১৭১-৩৪৫০৪২
E-mail : ilrclab@yahoo.com

প্রচ্ছদ : মোমিন উদ্দীন খালেদ

মুদ্রণে : আল-ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস, মগবাজার, ঢাকা।

দাম : ৩৫ টাকা US $ 3

Published by Advocate MUHAMMAD NAZRUL ISLAM, General Secretary, Islamic Law Research Centre and Legal Aid Bangladesh. Pisciculture Bhaban (3rd Floor) 14, Shymoli, Shymoli bus stand, Dhaka-1207 Bangladesh, Printed at Al-Falah Printing Press, Moghbazar, Dhaka, Price Tk. 35 US$ 3

সূচিপত্র

লেখা আহ্বান

এই পত্রিকায় ইসলামী আইন ও বিচার সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের তথ্যভিত্তিক ও গবেষণাধর্মী লেখা এবং সাময়িক প্রসঙ্গ স্থান পাবে যেমন-

১. ইসলামী আইনের ইতিহাস
২. বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন শাসনামলে ইসলামী বিচার ব্যবস্থার স্বরূপ
৩. ইসলামী আইন ও প্রচলিত আইনের তুলনামূলক পর্যালোচনা
৪. ইসলামে অর্থনৈতিক, শ্রমনৈতিক, সামাজিক ও নারী অধিকার সংক্রান্ত বিধান
৫. বর্তমান যুগে মুসলিম দেশসমূহে শরীয়াহ আইন প্রবর্তনের প্রচেষ্টা ও প্রয়োজনীয়তা
৬. ইসলামী আইন ও মানবাধিকার
৭. যুগে যুগে মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ ও ইসলামী আইন
৮. গণতন্ত্র ও ইসলাম
৯. ইসলাম ও রাষ্ট্রীয় সামাজিক সন্ত্রাস ইত্যাদি। লেখার সাথে লেখকের পরিচিতি লিখে পাঠানোকেও গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করা হবে। লেখা কাগজের এক পৃষ্ঠায় হতে হবে। অমনোনীত লেখা ফেরত দেয়া হয় না।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা :
সম্পাদক
ইসলামী আইন ও বিচার
ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ
পিসি কালচার ভবন (৪র্থ তলা) ১৪, শ্যামলী
শ্যামলী বাসষ্ট্যান্ড, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১৩১৭০৫, মোবাইল : ০১৭১-৩৪৫০৪২
E-mail :ilrclab@yahoo.com

আপনাদের প্রশ্নের জবাব

ইসলামী আইন ও বিচার এর পাতায় ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থা, ইসলামী শরীয়ত এবং দৈনন্দিন জীবন যাপনের বিভিন্ন ও বিচিত্র সমস্যাবলী সংক্রান্ত প্রশ্ন আহ্বান করা হচ্ছে।

দৃষ্টি আকর্ষণ

বছরে ৪টি সংখ্যা নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। গ্রাহক ও এজেন্টগণ যোগাযোগ করুন। নিয়মিত গ্রাহক ও এজেন্টদের জন্য রয়েছে বিশেষ ছাড়।

পাঠকের মতামত

সম্মানিত পাঠকদের মূল্যবান মতামত আমরা গুরুত্বসহকারে ছাপিয়ে থাকি।

সম্পাদকীয়

ইসলামী ফিকহের মধ্যেই আমাদের জীবন সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে

একুশ শতকে আমরা মুসলমানরা এক নতুন পৃথিবীতে বসবাস করছি। সমাজের চেহারা পালটে গেছে। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়েছে। মূল্যবোধগুলো যথার্থ ফর্মে নেই। অনেক ওলট পালট হয়ে গেছে।

সভ্যতার বিবর্তন। একটি সভ্যতার আধিপত্য ব্যাহত করে আর একটি সভ্যতার উত্থান। মুসলমানরা নতুন নতুন সমস্যার মুখোমুখি বিগত দেড় দুশো বছর থেকে। কিন্তু তার সমাধান নিজেদের জীবন বিধানে সন্ধান না করে আমরা বিজয়ী সভ্যতার পক্ষপুটে আশ্রয় নিয়েছি। আমাদের কাছে একটা জীবন বিধান আছে আল্লাহর দেয়া। যার সত্যতা বিশুদ্ধতা ও সার্বিক ক্ষমতায় সামান্যতম সন্দিহান হলেও আমাদের ঈমান খতম হয়ে যায়। আমরা আর মুসলমান থাকতে পারি না। অথচ আমরা তাকে স্থগিত রেখেছি। অন্যের দ্বারস্থ হয়েছি। জীবন পরিচালনা করছি ইউরোপীয় খৃষ্টবাদীদের তৈরি আইনের আওতায়। আইন নিয়ে আমরা নাড়াচাড়া করছি। কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের এ আইন পড়াচ্ছি ও শেখাচ্ছি। এ আইন নিয়ে গবেষণা করছি। মোটা মোটা বই কেতাব লিখছি। পার্লামেন্টে এ আইন নিয়ে বিতর্ক করছি। দেওয়ানী ফৌজদারী আদালতে লোয়ার কোর্ট হায়ার কোর্টে সর্বত্রই এ আইনের আওতায় মামলা মোকদ্দমার ফায়সালা দিয়ে দিলে কোনো মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।" (আল আহযাব ঃ ৩৬)

আল্লাহর কিতাব কুরআন আমাদের জীবন ও জীবনের বিভিন্ন কর্ম তৎপরতা সম্পর্কে চূড়ান্ত ও অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছে। রসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ও সাল্লাম সেই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে জীবন সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করে গেছেন। পরবর্তী হাজার বছরের অধিককাল সে ব্যবস্থা থেকে মুসলমানদের বিচ্যুতি ঘটেনি। অথচ হাজার হাজার বছরে জীবনে সমাজে রাষ্ট্রে পরিবর্তন কম আসেনি। এসব পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলার জন্য ইসলামী ফিক্হ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এই ফিক্হ ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাহ। আল্লাহর কিতাব যে বিধান দিয়েছে রসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেটিই বাস্তবায়ন করেছেন। সেটি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে যদি আরো কিছুর প্রয়োজন হয়ে থাকে তাহলে তা তিনি আল্লাহর হুকুমে নিজের তরফ থেকে সংযুক্ত করে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেছেন,

'তোমাদের সংগী বিভ্রান্ত নয়, বিপথগামীও নয় এবং মনগড়া কথাও বলে না। সে যা বলে তা তার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট ছাড়া আর কিছুই নয়।' (আন নাজম ঃ ২-৪)

আল্লাহ আরো বলেছেন,

'রসূল তোমাদের যা কিছু দেয় তা গ্রহণ করো এবং যা থেকে তোমাদের নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাকো। আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহ কঠোর শাস্তি দাতা।' (আল হাশর ঃ ৭)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও বলেছেন, 'আমি যখন কোনো বিষয়ে তোমাদের নির্দেশ দেই, তা যথাসাধ্য পালন করো আর যে বিষয়ে বিরত থাকতে বলি তা থেকে বিরত থাকো।' (বুখারী ও মুসলিম)

আল্লাহ ও তাঁর রসূলই হচ্ছেন ইসলামী শরীয়া এবং ইসলামী ফিক্‌হ ও আইন ব্যবস্থার মূল প্রবক্তা, উদ্ভাবক ও পরিচালক। এজন্য আল্লাহ নিজের নিছিদ্র ব্যবস্থাপনায় তাঁর কিতাব কুরআনকে যেমন সংরক্ষণ করেছেন সকল প্রকার ভুল ত্রুটি অবক্ষয় থেকে তেমনি তাঁর রসূলের বানী ও কর্মকান্ডকেও মানবিক ব্যবস্থাপনায় সংরক্ষণ করার দীর্ঘ মেয়াদী ব্যবস্থা করেছেন। এরপর এই ফিক্‌হ ব্যবস্থাপনার মধ্যে এমন একটি গতিশীলতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন যার ফলে কিয়ামত পর্যন্ত শত শত হাজার হাজার বছর তা সক্রিয় ও কার্যকর থাকতে সক্ষম। এক্ষেত্রে মু'আয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে ইয়ামনে প্রশাসক নিযুক্ত করে পাঠাবার সময় শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হলে কিভাবে তার সমাধান করবেন এ সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমি প্রথমে আল্লাহর কিতাব থেকে সমাধান খুঁজবো। সেখানে সমাধান না পেলে রসূলের সুন্নাতে সমাধান খুঁজবো। সেখানে সমাধান না পেলে নিজের বুদ্ধিবৃত্তিক ফায়সালা দান করবো। নবী স. তাঁর এ সিদ্ধান্তে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব অধ্যয়ন, পর্যালোচনা ও গবেষণা এবং রসূলের বাণী ও কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষনের মাধ্যমে হযরত মু'আযের যে মানসিক প্রবণতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক মেজাজ গড়ে ওঠে তার ভিত্তিতে তিনি নতুন নতুন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। এক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহ এবং এই উভয়ের অনুগত বুদ্ধিবৃত্তিক সিদ্ধান্ত তথা ইজতিহাদ এই তিনটিই হয় ইসলামী ফিকহের পরিচালিকা শক্তি।

মানুষের জীবন যেমন জীবন্ত ও গতিশীল ইসলামী ফিক্‌হও অনুরূপ একটি জীবন্ত ও গতিশীল আইন ব্যবস্থা। তাই জীবনের গতিশীলতার সাথে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে যাবার ক্ষমতা তার আছে। পরিবর্তিত অবস্থায় এই আইনের প্রয়োগ তাই একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যামানা ও অবস্থার পরিবর্তন সত্বেও মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য ফকীহ ও মুজতাহিদগণ কুরআন ও সুন্নাহর ব্যাখ্যা করে কিছু মূলনীতি প্রণয়ন করেছেন। প্রতি যুগে এরি ভিত্তিতে তাঁরা পরিবর্তিত অবস্থায় ফিকহী বিধান প্রয়োগ ও প্রবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে গেছেন। বিগত চৌদ্দ'শ বছরে ইসলাম এমন একটা সময় অতিক্রম করে এসেছে যখন মুসলমানদের মধ্যে এই ধরনের সর্বগুণ সম্পন্ন ফকীহ মুজতাহিদ ও ইসলামী ব্যক্তিত্বের কমতি ছিল না। তাঁরা কুরআন ও সুন্নাহর যথাযথ ব্যাখ্যায় পারদর্শী ছিলেন। কুরআন ও সুন্নাহ থেকে মূলনীতি উদ্ভাবন করে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও পরিস্থিতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে জীবনের নতুন নতুন সমস্যার সমাধান করে গেছেন। ইসলামী শরীয়তের মানবিক ও সার্বিক কল্যাণকামিতা এবং ফিক্‌হী আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য ও লক্ষের ওপর তাঁদের দৃষ্টি প্রসারিত ছিল। তাঁরা ছিলেন

যামানার অশ্বারোহী। যামানা তাঁদের ওপর সওয়ার হতে পারেনি। তাঁরা যামানার পিঠে সওয়ার হয়েছিলেন। ইসলামী মনন ও ইসলামী চিন্তা এবং আল্লাহ ও রসূলের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ও তাকওয়া তাঁদের সমগ্র কর্মকান্ডের মধ্যে প্রাণশক্তির মতো সক্রিয় ও সচল ছিল। মানুষকে তাঁরা আল্লাহর বান্দায় পরিণত করে রেখেছিলেন। প্রবৃত্তি শয়তান ও তাগুতের বন্দেগী থেকে মানুষকে দূরে রেখেছিলেন। এই ফকীহ ও মুজতাহিদগণের ফতওয়া এবং তাঁদের রচিত ফিক্হী সিদ্ধান্ত গুলো সমকালীন মুসলিম সমাজে প্রতিষ্ঠিত সরকারের আইনের মতো ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। তাঁদের ইলমী শ্রেষ্ঠত্ব, ঈমানী বলিষ্ঠতা, তাকওয়া, চারিত্রিক দৃঢ়তা, নিস্বার্থপরতা এবং অন্যায় ও জুলুমের বিরুদ্ধে আপোশহীন ভূমিকার ফলে এটা সম্ভব হয়েছিল।

যামানা পরিবর্তনশীল। কালের চাকা ঘুরছে অবিরাম গতিতে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মানুষ একই অবস্থায় থাকতে পারে না। লক্ষচ্যুত আদর্শচ্যুত হয়েছে মানুষ। মুসলমানদের মধ্যে অবক্ষয় নেমে এসেছে। কুরআন সুন্নাহ বিধৃত পথ থেকে তারা বিচ্যুত হয়েছে। ফলে তাদের ওপর চেপে বসেছে আল্লাহর বিধান বিরোধী বিজাতির শাসন। সমগ্র মুসলিম বিশ্ব তলিয়ে গেছে অন্ধকারে। আল্লাহদ্রোহিতা ও আল্লাহর বিধানের প্রতি সংশয়ের বীজ বপন করে গেছে বিজাতীয় শাসকরা সমস্ত মুসলিম দেশে, বিশেষ করে তাদের প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে। আর যে দু' একটি দেশ তাদের শাসনের আওতায় আসেনি তারাও পরবর্তীকালে উন্নত বিশ্বের সাথে সমান তালে চলার তাগিদে নিজেদের মেধাবী সন্তানদেরকে সেখান থেকে শিখিয়ে পড়িয়ে এনে নিজেদের ইসলামী বিধান থেকে বিচ্যুতির দায়িত্ব সম্পন্ন করেছে।

এভাবে স্বাধীন মুসলিম বিশ্ব আজ এক সংশয় এবং ঈমান ও কুফরীর দ্বন্দ্বের কাল অতিক্রম করছে। ইসলামের কিছু আনুষ্ঠানিকতা বজায় আছে। নামায পড়ার জন্য মসজিদ আছে। মসজিদে আযান হয়। পাঁচ ওয়াক্ত নামায হয়। মুসলমানদের একটা ক্ষুদ্র অংশ এই মসজিদগুলোয় যায়। বৃহত্তম অংশ নামায না পড়েও মুসলমান থাকছে। রমযানে মুসলমানদের একটা অংশ রোযা রাখে। তবে ঈদের নামাযে যায় সবাই। যাকাত দেবার প্রতি মুসলিম ধনীদের আগ্রহ কম। কেউ কেউ যাকাত দেয় হিসাব না করেই। কাপড়ের কয়েকটা গাঁটরী এনে ফকির মিসকিনদের মধ্যে বিলি করে দায়মুক্ত হয়। হজ্জের মওসূমে সারা মুসলিম বিশ্বে হজ্জ করার রেওয়াজটা জারি আছে উৎসবের আমেজে।

এভাবে ইসলামের এই আনুষ্ঠানিকতার দিক দিয়ে মুসলমানদেরকে কিছুটা চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু বাকি সমগ্র জীবনের কর্মকান্ডের কোনো পরোয়া নেই তাদের। সেখানকার করে কর্তৃত্ব চলছে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের, না প্রবৃত্তির শয়তানের ও তাগুতের? তা দেখার প্রয়োজন বোধ করে না তারা। অথচ মুসলমান থাকতে চায় সবাই। সারা বিশ্বে ইসলাম ও মুসলমানদের ওপর কুফরীর আক্রমনকে সবাই অনুভব করে। কিন্তু দুর্বল ও সংশয়িত ঈমান তাদরকে দুর্বলচিত্ত করে দিয়েছে। কুফরের আক্রমনকে কুফরীর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে ঠেকানো যাবে না। আল্লাহ পূর্বাহ্নেই বলে দিয়েছেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায়, 'ইহুদি ও খৃষ্টানরা তোমার প্রতি কখনোই সন্তুষ্ট হবে না যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করো।'(আল বাকারা ঃ ১২০)

কাজেই পাশ্চাত্য তথা পশ্চিমা বিশ্বের ইহুদি ও খৃষ্টান চক্রের আধিপত্য থেকে মুসলমানদের পরিত্রান লাভ করতে হবে। এ আধিপত্য বিশেষ করে শিক্ষা ও আইনের ক্ষেত্রে। আমাদের

আইন প্রণয়নের ও সমাজ গঠনের নিজস্ব উন্নত অত্যাধুনিক ব্যবস্থা আছে। হাজার বারো'শ তেরো'শ বছর পর্যন্ত আমরা আমাদের দেশ ও মিল্লাতকে এর মাধ্যমে পরিচালিত করে এসেছি। আমাদের মধ্যে অনেক ঘাটতি আছে। অনেক কিছুর অভাব আছে আমাদের । কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দেয়া মূল সম্পদ কুরআন ও সুন্নাহ এখনো আমাদের কাছে আছে অপরিবর্তিত অবস্থায়। এর প্রতি ঈমান ও বিশ্বাস এখনো স্থায়ী আছে। আর সবচাইতে বড় কথা হচ্ছে, বিগত হাজার বারো'শ বছরের ফকীহ মুজতাহিদ কাজী ও মুফতীগণের ফতওয়া, ইজতিহাদ, ফিক্‌হ চর্চা ও সিদ্ধান্ত দানের নজির কেতাবের বড় বড় ভলিউম আকারে আমাদের এখানে মওজুদ আছে। এগুলো ধ্বংস ও অন্তরহিত হয়ে যায়নি। এখনো এগুলোর চর্চা আছে। মুসলিম জনগণের একটা বিশাল অংশ এখনো এর প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস রাখে। তারা এর মাধ্যমে নিজেদের জীবন পরিচালনা করার প্রয়াসী। শতাব্দী ব্যাপী বিজাতীয় শাসন ও আইন ব্যবস্থার প্রচন্ড দাপটের মধ্যেও মুসলিম পারিবারিক আইনের নিরবচ্ছিন্ন জনপ্রিয়তা এরই প্রমাণ।

কাজেই আজকের স্বাধীন পরিবেশে যেখানে আমরা মুসলমানরা নিজেরাই নিজেদেরকে শাসন করছি সেখানে আমাদের জীবনের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, নৈতিক, সাংস্কৃতিক তথা সকল ক্ষেত্র গড়ে তোলায় এবং সকল ক্ষেত্র শাসন ও পরিচালনায় অন্যের দ্বারস্থ না হয়ে আমাদের নিজস্ব ফিক্‌হী ব্যবস্থাকে ব্যবহার করা উচিত। পাশ্চাত্য আইনের তুলনায় ইসলামী ফিক্‌হী ব্যবস্থার ব্যাপকতা অনেক বেশি। পাশ্চাত্য আইন যেখানে ধর্মীয় ও নৈতিক এবং এই ধরনের জীবনের অনেক একান্ত বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত দিতে অক্ষম এবং এগুলোকে মানুষের প্রাইভেট লাইফ আখ্যায়িত করে সমাজ ও মানুষের মধ্যে বিভেদ ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করে সেখানে ইসলামী ফিক্‌হ ধর্মীয় ও নৈতিক সহ জীবনের সকল ক্ষেত্রকেই নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে। ফলে ধর্মে ধর্মে, মানুষে মানুষে এবং দেশি বিদেশির মধ্যে কোনো বিভেদ বিশৃংখলা সৃষ্টি হয় না। বিগত বারো'শ বছর ইসলামী বিশ্বে ইসলামী শরীয়া ও ইসলামী ফিকহের শাসন এর জ্বলন্ত প্রমাণ। এই বারো'শ বছরের পৃথিবী আমাদের সাম্প্রতিক কালের দু'শ বছরের পৃথিবীর মতো এমন অশান্ত, অস্থির ও জ্বলন্ত অংগার সদৃশ ছিল না।

ইসলামী ফিকহের মূল লক্ষ হলো মানুষের ও মানবতার কল্যাণ। মানুষকে দায়িত্ব সচতেন করা, মানুষের অধিকার পুরোপুরি আদায় করা, জুলুম না করা এবং জুলুম থেকে মানুষকে রক্ষা করা। জালেমকে প্রতিহত করা, মজলুমকে সহায়তা করা এবং ইনসাফ ও সামাজিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত করাই ইসলামী ফিকহের উদ্দেশ্য। মুসলমানের জন্য এক মানদন্ড এবং অমুসলমানের জন্য আর এক মানদন্ড এ ফিক্‌হী ব্যবস্থায় কল্পনাই করা যায় না। কারণ এখানে আল্লাহর কাছে জবাবদিহির ভাবধারা সব সময় কার্যকর থাকে। একুশ শতকের সচেতন বিশ্ব সমাজের সামনে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র গুয়ানতানামোয় মুসলিম বন্দীদের সাথে যে বর্বরোচিত অমানবিক ব্যবহার করছে এবং আল্লাহর পাক কালাম কুরআনের অবমাননা করে একটি ভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি তাদের ঘৃণা প্রকাশের যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছে তা কেবল পাশ্চাত্যের অমানবিক ও জুলুমতান্ত্রিক আইনের কারণেই সম্ভব হয়েছে।

মুসলমানদের এ থেকে শিক্ষা নেয়া উচিত। আমাদের নিজস্ব আইনের দিকেই আমাদের ফিরে আসা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। ইসলামী ফিকহের মধ্যে আমরা আমাদের জীবনের ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ভারসাম্যপূর্ণ সমাধান খুঁজে পাবো এতে কোনো সন্দেহ নেই।

- আবদুল মান্নান তালিব

ইসলামী শরীয়তের সাধারণ বৈশিষ্ট

ড: ইউসুফ হামেদ আল আলেম

ইসলামী শরীয়তের কতিপয় সাধারণ বৈশিষ্ট আছে। সেগুলো শরীয়তের অন্যান্য বিষয় থেকে পৃথকভাবে চিহ্নিত। ইসলামী শরীয়ত হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। পৃথিবীতে যতদিন মানুষের অস্তিত্ব থাকবে ততদিন এ জীবন বিধানও প্রচলিত থাকবে। শরীয়ত ব্যবস্থার এ বৈশিষ্টগুলো দায়িত্ব সম্পন্ন এবং স্থান ও কাল ভেদে ব্যাপক হয়ে থাকে। এ বৈশিষ্টগুলো স্থবিরতা ও নমনীয়তার মাঝামাঝি অবস্থান করে। আবার কখনো দীন ও দুনিয়া এবং ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণার্থে এগুলো বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করে। কখনো এগুলো আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমানের প্রতিবন্ধকের সাথে আচরণবিধি নির্ণয় করে। আবার কখনো শরীয়তের উৎসকে বিকৃতি ও পরিবর্তন থেকে রক্ষা করে।

প্রথম বৈশিষ্ট : শরীয়তের ব্যাপকতা

দায়িত্বশীলদের প্রেক্ষিতে শরীয়তের বিধান ব্যাপকতর তথা সবার জন্য হয়ে থাকে। অর্থাৎ দায়িত্বের শর্ত যেখানে উপস্থিত থাকে সেখানে আল্লাহর কোনো বিধান অন্যদের বাদ দিয়ে কেবলমাত্র একজন দায়িত্বশীলকে বিশেষভাবে আহ্বান করে না। এই বিধানের আওতাধীন করা থেকে কোনো একজন দায়িত্বশীলকেও বাদ দেয় না। কয়েকটি বিষয় এদিকে ইংগিত করে।

প্রথম বিষয়টি হচ্ছে : পরস্পর সাহায্যকারী নস্। যেমন আল্লাহর বাণী : '(হে মুহাম্মদ) আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সমগ্র মানব জাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী বানিয়ে।'[৬৭]

'(হে মুহাম্মদ!) বলে দাও, হে মানব জাতি! আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের সবার কাছে প্রেরিত হয়েছি।'[৬৮] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

'আমাকে লাল কালো নির্বিশেষে সমগ্র মানব জাতির কাছে পাঠানো হয়েছে।'[৬৯]

এই নস্গুলো এদিকে ইংগিত করে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত সাধারণভাবে সবার জন্য, কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষের জন্য নয়। কারণ কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষের জন্য হলে আর সমগ্র মানব জাতির জন্য প্রেরিত হবার কথা বলা হতো না। যদি নবীর বিশেষ বিধানের দায় এক ব্যক্তির ওপর না পড়ে, যেহেতু নবী তার জন্য প্রেরিত হননি, তাহলে এই বিধানকে সমগ্র মানব জাতির কাছে প্রেরিত বলা

লেখক : ডক্টর ইউসুফ হামেদ আল আলেম ছিলেন সুদানের খার্তুম বিশ্ববিদ্যালয়ের কুরআন বিভাগের চেয়ারম্যান। মিসরের আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি এ বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৭১ সালে প্রকাশিত এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যতালিকাভুক্ত তাঁর আন্তরজাতিক খ্যাতি সম্পন্ন গ্রন্থ 'আল মাকাসিদুল আম্মাতু লিশ্ শারীয়াতিল ইসলামিয়াহ' থেকে এ প্রবন্ধটি গৃহীত।

হতো না। কাজেই এ বক্তব্য অগ্রহণযোগ্য। আল্লাহর বাণী থেকেও এ ব্যাপকতা প্রমাণ হয়ঃ

'হে রসূল! তোমার প্রতি তোমার রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল হয়েছে, তা পৌঁছিয়ে দাও।'[৭০]

এ আয়াতটি ইংগিত করে যে, রসূলের স. প্রতি নাযিলকৃত সমগ্র শরীয়ত সকল মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া ওয়াজিব। প্রথম দুটি আয়াত ও এ হাদীসটি প্রকাশ করে যে, রসূলের স. আগমণ সমগ্র মানব জাতির জন্য এবং এ আয়াতটি থেকে প্রমাণ হয় যে, তাঁর দাওয়াত সমগ্র মানব জাতির জন্য।[৭১]

দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে : আল্লাহর বিধান সমূহ মানুষের কল্যাণার্থে রচিত হয়েছে। কাজেই কল্যাণের চাহিদার দিক দিয়ে সকল মানুষ সমান। কারণ মানব সম্প্রদায়ের প্রয়োজনের ক্ষেত্রে যে অভিন্নতা আছে সেই অনুযায়ীই সেগুলো তৈরি করা হয়েছে। সেগুলো যদি বিশেষ বৈশিষ্টের ভিত্তিতে তৈরি করা হতো তাহলে সাধারণভাবে মানুষের কল্যাণের জন্য সেগুলো ব্যবহৃত হতো না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি কোনো বিষয়কে বিশিষ্টতা দিয়ে থাকেন তাহলে তারি ভিত্তিতে কোনো বিষয়কে বিশিষ্ট করা ছাড়া আর কোনো কিছুই এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হবে না। অথবা তাঁর কোনো সাহাবাকে যদি কোনো বিষয়ে বিশিষ্টতা দান করা হয়ে থাকে, যেমন খুযাইমার সাক্ষী এবং আবু বুরদার যবেহকৃত ছাগীর অংগ সমূহ। ইমামূল হারামাইন বলেন:[৭২] 'বিশেষ বিধান সাধারণ বিধানের সাথে সম্পর্কিত। এগুলো বিপুলের মধ্যে সামান্য। তারপর প্রত্যেক প্রকার মানুষের মধ্যে বিশিষ্টতার ভিত্তিতে শ্রেণী বিভাগ সৃষ্টি হয়েছে। এভাবে মেয়েরা পুরুষদের বিধান থেকে বিশিষ্টতা অর্জন করেছে, মুসাফিররা মুকীমদের বিধান থেকে বিশেষত্ব লাভ করেছে এবং এভাবে দায়িত্বশীলদের মধ্যে আরো বহু দল বৈশিষ্টের অধিকারী হয়েছে।'[৭৩]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের মাধ্যমে কোনো কোনো সাহাবাকে যে বিশিষ্টতা দান করা হয়েছে তার মধ্যে এ সম্পর্কিত প্রমাণ ও ঘোষণা রয়েছে যে, শরীয়তের বিধান সমূহ বিশিষ্ট আইন থেকে মুক্ত।

তৃতীয় বিষয়টি হচ্ছে : সাহাবা, তাবেয়ী ও পরবর্তীকালের ফকীহগণের ইজমা। এ জন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কার্যাবলীকে তাঁরা সমধর্মী সকল বিষয়ের জন্য গ্রহণীয় প্রমাণে পরিণত করেছেন এবং বিশেষ বিষয়ের সাথে যে বিধানগুলো জড়িত সেগুলো চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন। সাধারণভাবে অপ্রকাশ্য সাধারণ বিষয়াবলীর ওপর এগুলো জারী করায় কোনো ক্ষতি নেই। মহান আল্লাহ বলেনঃ

'তারপর যায়েদ যখন যয়নবের সাথে বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করলো তখন আমি তাকে তোমার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করলাম। যাতে মুমিনদের জন্য তাতে কোনো বিঘ্ন না হয়।'[৭৪] এখানে ব্যক্তি বিশেষের ওপর হুকুম প্রতিষ্ঠিত করে তার মাধ্যমে তাকে জারী করা হয় সর্বসাধারণের জন্য।[৭৫]

চতুর্থ বিষয়টি হচ্ছে : কোনো কোনো হুকুম যদি ব্যক্তি বিশেষকে দেয়া যায়, যার ফলে বিশেষ কিছু লোক তার আওতার বাইরে চলে যায় তাহলে শরীয়তের নিয়ম কানুনের ক্ষেত্রেও এ ধরনের বিষয় জায়েয হবে। এ ক্ষেত্রে দায়িত্বের শর্তাবলী যার মধ্যে পূর্ণতা লাভ করেছে এমন কারোর প্রতি এই হুকুম জারী করা যাবে না। সমস্ত বিষয়ের মূল যে ঈমান তার ব্যাপারেও একই কথা। অথচ এটি সর্বসম্মতিক্রমে বাতিল। অর্থাৎ শরীয়তের বিধান যার মধ্যে দায়িত্বের শর্তাবলী পূর্ণতা লাভ করেছে এমন সবার জন্য। স্থান কালের ভিত্তিতে তার ব্যাপকতা অত্যাবশ্যকীয় হয়।[৭৬]

কারণ যদি এমনটি না হতো, তাহলে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে যে সকল সাহাবা ছিলেন তাঁদের প্রজন্মের ওপর কুরআন ও সুন্নাহর বিধান জারী হতে পারতো না। এগুলো হিজাযবাসীদের উপরও জারী হতে পারত না। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কোনো মুসলিম আলেমও এ কথা বলেন নি। এভাবে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রত্যেকটি দায়িত্বশীলের উপর শরীয়তের বিধান জারী হবে। প্রত্যেক যুগে ও প্রত্যেক স্থানে জারী হবে। এটিই কাংখিত। এ বৈশিষ্টটি কিয়াস অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী দলিল হিসাবে বিবেচিত হবে। কারণ নবী সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কিছু লোককে বিশেষভাবে সম্বোধন করা বা কিছু লোকের জন্য বিশেষ হুকুম জারী করার অনেক ঘটনা ঘটেছে। সেই ঘটনাগুলোকে সর্বসাধারণের জন্য ব্যাপক করার কোনো প্রমাণ সেখানে পাওয়া যায় না। কাজেই এ কথা ঠিক নয় যে, শরীয়ত সর্বজনীনতার ভিত্তিতে রচিত, তবে তার মধ্যে কিছু ঘটনাকে বিশিষ্টতা দান করা হয়েছে যদিও তা উদ্দেশ্য নয় এবং সেখানে অনুল্লেখকে উল্লেখের সাথে যুক্ত করেছে এমন একটি নির্ভরযোগ্য শব্দও পাওয়া যাবে না। এ থেকে বুঝা যায়, প্রত্যেক ঘটনার অন্তরনিহিত অর্থ তার সাথে অপরিহার্যভাবে সংযুক্ত হয়ে যায়। আর এটিই হয় কিয়াসের অর্থ। সাহাবা কিরাম রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিমের কার্যক্রম এ বক্তব্যেরই সমর্থক।[৭৭]

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট : শরীয়তের বিধানসমূহ স্থবিরতা ও নমনীয়তার মাঝামাঝি অবস্থান করে

শরীয়তের বিধানসমূহ দু'ভাগে বিভক্ত। এক ধরনের বিধানে কোনো পরিবর্তন ও পরিবর্ধন বা সংকোচন নেই, এগুলো স্থির ও দৃঢ়বদ্ধ। স্থান-কালের পরিবর্তন তার মধ্যে কোনো পরিবর্তন ঘটায় না। আর এক ধরনের বিধান আছে যেগুলো স্থান-কাল-অবস্থা-পরিস্থিতি-পরিবেশের প্রভাবাধীন হয়। প্রচলন ও অভ্যাসের পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মানবতার কল্যাণের প্রেক্ষিতে শরীয়তের মূলনীতি ও মৌলিক বিধানকে অটুট রেখে তার মধ্যে পরিবর্তন সূচিত হয়।

ইমাম ইবনে কাইয়েম তাঁর 'ইগাছাতুল লাহফান' গ্রন্থে লিখেছেন : শরীয়তের বিধান দুই প্রকারের। এক প্রকারের বিধান সবসময় একই অবস্থায় থাকে। স্থান ও কালের পরিবর্তনে তার মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসে না। ইমামগণের ইজতিহাদও তার মধ্যে পরিবর্তন সাধনের ক্ষমতা রাখে না। যেমন ফরয, ওয়াজিব, হারাম, শরীয়ত নির্ধারিত

অপরাধ দণ্ডবিধি এবং এ ধরনের আরো বিভিন্ন বিষয়। যেগুলোর জন্য এগুলো রচিত হয়েছে ইজতিহাদ করে সেগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবহার করার কোনো সুযোগ নেই। দ্বিতীয় ধরনের বিধান স্থান, কাল ও অবস্থার পরিবর্তনে মানবতার কল্যাণের স্বার্থে পরিবর্তিত হয়। যেমন অনুমান ভিত্তিক পরিমাপ ও তার গুণাবলী। অবশ্যই শরীয়ত প্রণেতা নিজেই প্রয়োজন অনুযায়ী তার মধ্যে বৈচিত্র সৃষ্টি করে দিয়েছেন। চতুর্থ দফায় এক মুদ (চার গ্যালন) শরাব পান করার পর হত্যার বিধান দিয়েছেন। আর ঘরবাড়ী পোড়াবার সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যদি তার পেছনে স্ত্রী ও সন্তানাদি না থাকে। তা ছাড়া বিভিন্ন সময় অর্থদণ্ড সহ তিরষ্কার করার বিধান।[৭৮]

চালচলন ও রীতিনীতির বিভিন্নতার ফলে প্রয়োজন ও লক্ষও বিভিন্ন হয়ে যায়। কাজেই বিধানের শর্তাদিও বিভিন্ন হয়ে গেলে মূলত দায়িত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে বিভিন্নতা প্রমাণিত হয় না। কারণ দুনিয়ার জীবন ও দায়িত্ব যদিও অনন্তকালীন নয় তবুও শরীয়তের বিধান রচিত হয়েছে চিরস্থায়ীভাবে। তাই শরীয়ত 'আরো কিছুর' মুখাপেক্ষি নয়। তাই এক্ষেত্রে বিভিন্নতার অর্থ হচ্ছে, রীতিনীতি যখন বিভিন্ন হয়ে যায় তখন প্রত্যেকটি রীতিই শরীয়তের মূলের দিকে ফিরে আসে এবং শরীয়তের হুকুম নিজের ওপর আরোপ করে নেয় এই যুক্তিতে যে, কোনো রীতিই শরীয়তের মূলনীতি থেকে আলাদা হয়ে গেলে শরীয়তের দৃষ্টিতে তার কোনো মূল্য থাকে না।

অনুরূপ সাবালক হয়ে যাবার ক্ষেত্রেও। যেমন শিশুকে দায়িত্বমুক্ত রাখা হয়েছে। সাবালক না হওয়া পর্যন্ত তার ওপর কোনো দায়িত্ব অর্পিত হয় নি। সাবালক হওয়ার সাথে সাথেই তার ওপর দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সাবালক হওয়ার পূর্বে দায়িত্বমুক্ত রাখা এবং তারপর সাবালক হওয়ার পরই দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া। এর কারণ দায়িত্ব আরোপ করার ক্ষেত্রে বিভিন্নতা নয়। বরং এ বিভিন্নতা এসেছে রীতিনীতি ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মধ্যে। স্ত্রীসংগমের পরের বিধানের ব্যাপারেও একই কথা। এক্ষেত্রে মোহরানা না দেবার ব্যাপারে স্বামীর কথাই গ্রাহ্য হবে এবং এর ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে রীতি রেওয়াজের উপর। আবার রীতিনীতির পরিবর্তনও হয়। সে ক্ষেত্রে স্ত্রীর কথা গ্রাহ্য হবে।[৭৯]

এই ধরনের বিধান যাতে আপাত দৃষ্টিতে পরিবর্তন গৃহীত হয়, এগুলোও শরীয়তের বিধান এবং তার অবিভাজ্য অংশ। এগুলো শরীয়তের বিরাট স্তম্ভ। এই বিধানগুলোর কোন কোনটির ইজতিহাদের মাধ্যমে পরিবর্তিত হওয়া এগুলোকে শরীয়ত থেকে আলাদা করে দেয় না বরং এর মাধ্যমে শরীয়তের মধ্যে ইজতিহাদ ও ইসতিমবাত করার বৈধতার প্রমাণ পেশ করে।

এই বৈশিষ্টের মাধ্যমে ইসলামী শরীয়ত প্রত্যেকটি নতুন ঘটনাকে এবং প্রত্যেকটি ঘটনা যার প্রচলনেও সত্যনিষ্ঠদের রীতি রেওয়াজে পরিবর্তন সূচিত করে, তাকে শরীয়তের অন্তরভুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। কাজেই শরীয়তকে কেউ স্থবির বা ত্রুটিপূর্ণ বলতে পারবে না। তবে আল্লাহ যাদের চোখ ও দৃষ্টিকে মূর্খতার অন্ধকারে বা বক্রতায় আচ্ছন্ন করে রেখেছেন একমাত্র তারাই এ ধারণা করতে পারে।

তৃতীয় বৈশিষ্ট : শরীয়তের বিধানসমূহ সকল প্রকার প্রয়োজন পূরণে ও কল্যাণার্থে সুবিধা প্রদান করে

ইসলামী শরীয়তের বিধানসমূহ সকল প্রকার ইহকালীন, পরকালীন, ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক প্রয়োজন পূরণ ও কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত। শরীয়ত এমন কোনো দুনিয়ার পরিচয় দেয় না যার সম্পর্ক আখেরাতের সাথে নেই এবং এমন কোনো আখেরাতের পরিচয় দেয় না যার সম্পর্ক দুনিয়ার সাথে নেই। অন্যদিকে এমন কোনো সমষ্টির পরিচয় দেয়নি যার সম্পর্ক ব্যষ্টির সাথে নেই। ব্যষ্টি ও ব্যক্তি হচ্ছে অংশ ও অংগ এবং সমষ্টি ও সমাজ হচ্ছে সমগ্র ও দেহ। ব্যক্তি ও সমাজের প্রত্যেকেই নিজের প্রয়োজন পূরণে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। এ অবস্থায় শরীয়ত প্রয়োজন পূরণ ও কল্যাণ সাধনের ক্ষেত্রে ভারসাম্যের পদ্ধতি অবলম্বন করে। আর প্রয়োজন ও কল্যাণের মধ্যে ভারসাম্যে পৌঁছার পথ হচ্ছে : ন্যায়নীতি, সমতা, মিতাচার ও মধ্যমপন্থা। এ হচ্ছে তার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যের অন্তরভুক্ত। এ কারণে শরীয়তের আলেমগণ সাধারণ অভিভাবকত্বকে অপরিহার্য গণ্য করেছেন। কারণ এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ইনসাফ ও ন্যায়নীতির প্রতিষ্ঠা, অধিকার আদায় এবং সংঘটিত ও আসন্ন জুলুম প্রতিরোধ করা।

দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের উৎস বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন :

'আল্লাহ তোমাকে যা দিয়েছেন তা দিয়ে আখেরাতের আবাস অনুসন্ধান করো। আর দুনিয়া থেকে তোমাদের অংশ ভুলো না।'[৮০] কাতাদা বলেন : এর অর্থ হচ্ছে 'দুনিয়া থেকে হালাল রুজি আহরণ করার ক্ষেত্রে তোমার অংশ বিনষ্ট করো না। তোমার চাহিদা তুমি নিজেই পূর্ণ করবে এবং তোমার দুনিয়ার ফলাফলের প্রতি তুমি দৃষ্টি রাখবে। ইবনে উমর রা. বলেন : 'তুমি দুনিয়ার জন্য এমনভাবে জমি কর্ষণ করো যেন মনে হবে তুমি চিরকাল জীবন যাপন করবে এবং তুমি আখেরাতের জন্য এমনভাবে কাজ করো যেন মনে হবে তুমি আগামী কালই মারা যাবে।'[৮১]

দুনিয়ার কল্যাণ ও আখেরাতের কল্যাণের মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি করার ব্যাপারে শরীয়ত যা কামনা করে তার রূপরেখা এর মধ্যেই ফুটে উঠেছে। মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যত জীবনের স্বার্থে তার দুনিয়ার কল্যাণের সাথে আখেরাতের কল্যাণকে সংযুক্ত করার জন্য এবং সৎকাজে ও আল্লাহর হুকুম মেনে চলার কাজে দ্রুত অগ্রসর হবার ব্যাপারে উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এ দুটিই অপরিহার্য। এতে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের লাভ। কারণ অস্থায়ী কল্যাণের ওপর স্থায়ী কল্যাণকে প্রাধান্য দেয়ার ফলে মানুষের স্বার্থ চিন্তা ও দুনিয়া প্রীতি সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং আখেরাতের কল্যাণ লাভের আকাংখায় সে ত্যাগ ও অন্যদেরকে শরীক করতে উদ্বুদ্ধ হয়।

অতপর কিছু নিয়ম কানুন ব্যক্তি ও সমাজের এই কল্যাণগুলো নিয়ন্ত্রণ করে। সেগুলো নিম্নরূপ : যাকে আত্মকল্যাণ সাধনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, অন্য কেউ তার জন্য এই কল্যাণগুলো প্রতিষ্ঠিত করে দেবে না। অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজের কল্যাণ সাধনের ক্ষমতা রাখে তাকে তা অর্জন করে দেবার দায়িত্ব অন্য কারোর ওপর অর্পিত হয় নি। আবার

যে দায়িত্বশীলের কল্যাণ অন্যের সাথে জড়িত, বিনাকষ্টে যদি সে তা অর্জন করার ক্ষমতা রাখে তাহলে অন্যের তাকে সহায়তা করার কোনো দায়িত্ব নেই। আর যদি সে তা অর্জনে অক্ষম হয় এবং তা বিশেষ ও অগ্রবর্তী কল্যাণ হয় যা তার হাতছাড়া হয়ে গেছে এবং এ ক্ষেত্রে অন্যের কল্যাণ যদি সাধারণ ও ব্যাপকধর্মী হয় তাহলেও যাদের সাথে এ কল্যাণের সম্পর্ক রয়েছে এই কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত করে দেয়া তাদের দায়িত্বের অন্তরভুক্ত হয়ে যায়। তবে এর ফলে তাদের মূল কল্যাণ তার সমান বা তার চেয়ে বেশি কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হবে না। পূর্ণ ও আংশিক বিষয়ের কল্যাণ প্রসঙ্গে সামনের দিকে এর ওপর বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।[৮২]

ইসলামী শরীয়ত দুনিয়া ও আখেরাতের সকল প্রকার কল্যাণকে নিজের অন্তরভুক্ত করে নিয়েছে। কারণ শরীয়ত রচিত হয়েছে মানুষের কল্যাণার্থে। তার রচয়িতা হচ্ছেন তাদের স্রষ্টা ও রব। তিনি খুব ভালোভাবেই জানেন তাদের অবস্থা এবং তাদের কল্যাণ কিসে হয়। অন্যদিকে মানব রচিত আইন কেবলমাত্র দুনিয়ার কল্যাণের প্রতি নজর রাখে এবং ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করারও ক্ষমতা রাখে না।

চতুর্থ বৈশিষ্ট : দীনের প্রতিবন্ধকের সাথে আচরণবিধি নির্ণয় করে

ইসলামী শরীয়ত আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমানের প্রতিবন্ধকের সাথে আচরণবিধি নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষের তৈরি দুনিয়ার অন্যান্য আইন ব্যবস্থার মতো ইসলামী শরীয়তেরও একটি পার্থিব বিধিব্যবস্থা আছে। শরীয়তের আহকামের যে বিরোধিতা করে তাকে দমন ও তার শাস্তির ব্যবস্থা এর মাধ্যমে করা হয়। ইসলামী শরীয়ত এ দিক দিয়ে বৈশিষ্ট সম্পন্ন যে, সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্বাবধানকারী যিনি সর্বজ্ঞ এবং 'চোখের অপব্যবহার ও হৃদয়ে যা কিছু গোপন আছে সে সম্পর্কেও যিনি সঠিক খবর রাখেন' উপরন্তু 'যিনি সকল প্রকাশ্য ও গোপন বিষয় জানেন' তিনিই এর তত্ত্বাবধায়ক ও নিয়ন্ত্রক। কাজেই শরীয়তের বিধানের বিরোধিতা করে যে ব্যক্তি আল্লাহ নির্ধারিত সীমা লংঘন করে সে দুনিয়ার পাকড়াও থেকে রেহাই পেতে পারে। দুনিয়ার হিসাব ও শাস্তির হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারে। কিন্তু আল্লাহর পাকড়াও থেকে তার কোনো অবস্থাতেই মুক্তি নেই। সবকিছুই সে তার সামনেই উপস্থিত পাবে 'একটি কিতাবে উন্মুক্ত আকারে'। তা ছোট বড় কিছুই বাদ দেবে না বরং তার সমস্ত হিসাব রাখবে। [৮৩]

আল্লাহর পাকড়াও বা শাস্তি থেকে কারোর রেহাই নেই, এ দিকে ইংগিত করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :'অবশ্যই আমি একজন মানুষ। আর তোমরা অনেক সময় আমার কাছে আসো ঝগড়া বিবাদ নিয়ে। তোমাদের কেউ কেউ সম্ভবত অন্যের তুলনায় সুন্দর করে গুছিয়ে আলংকারিক ভাষায় নিজের বক্তব্য পেশ করে থাকে।[৮৪] আমি যেভাবে শুনি তেমনি ফায়সালা দিয়ে দেই। এ ক্ষেত্রে তোমাদের ভাইয়ের ন্যায্য পাওনার বিরুদ্ধে যদি আমি কোনো ফায়সালা দিয়ে দেই তাহলে তা গ্রহণ করো না। যে তা গ্রহণ করবে সে নিজের জন্য জাহান্নামের একটি অংশ কেটে নেবে।'[৮৫]

মানুষ মানুষের পাকড়াও এড়াতে পারলেও আল্লাহর পাকড়াও এড়াতে পারবে না,

এ হাদীসটি তার একটি প্রমাণ। আর যে ব্যক্তি অন্যায় বিরোধ করে বাহ্যত অন্যের কিছু অংশ খসিয়ে নেবে মূলত পর্দান্তরালে তা তার জন্য হারাম হবে এবং সে আযাবের ভাগীদার হবে। কারণ তার অন্তর গুনাহে লিপ্ত হয়েছে।

ইসলামী শরীয়তের এই বৈশিষ্টই শরীয়তের আইন ও মানুষের তৈরি আইনের মধ্যে বিরাট পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। শরীয়তের বিধান প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রেও এগুলো গুরুত্বপূর্ণ কার্যকারণ হিসাবে দেখা দেয়। এই কার্য়কারণ মানুষের তৈরি আইনের ক্ষেত্রেও দেখা দেয়, কিন্তু সত্য দীনের দিক নির্দেশনা ছাড়া অন্য কিছুতেই তারা সঠিক পথের সন্ধান পেতে পারে না। আর এই দিক নির্দেশনা একমাত্র মেনে চলারই যোগ্য। এখানে সামনে পেছনে কোথাও থেকে বাতিল ও অন্যায়ের অনুপ্রবেশের সুযোগ নেই।

পঞ্চম বৈশিষ্ট : শরীয়তের উৎসকে বিকৃতি ও পরিবর্তনমুক্ত রাখে

এই মুবারক শরীয়তকে বিকৃতি ও পরিবর্তন থেকে মহান আল্লাহ রক্ষা করেছেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানা থেকে আজ পর্যন্ত এ রক্ষা ব্যবস্থা অব্যাহত রয়েছে। এর দুটি পদ্ধতি আমাদের চোখে সুস্পষ্টভাবে ধরা দিয়েছে।

প্রথম পদ্ধতি : দ্ব্যর্থহীন দূরবর্তী ইশারার মাধ্যমে যা প্রকাশিত হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, 'আমিই কুরআন নাযিল করেছি এবং আমিই তার হেফাযতকারী।'[৮৬]

'এই কিতাবের আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে।'[৮৭]

'কোনো মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করবে না, সামনে থেকেও না এবং পেছন থেকেও না। এটি প্রজ্ঞাময় প্রশংসার্হ আল্লাহর কাছ থেকে অবতীর্ণ।'[৮৮]

'তোমার পূর্বে আমি যে সব রসূল ও নবী পাঠিয়েছি তাদের কেউ যখনই কিছু আকাংখা করেছে তখনই শয়তান তার আকাংখায় কিছু প্রক্ষিপ্ত করেছে। কিন্তু শয়তান যা প্রক্ষেপ করে আল্লাহ তা বিদুরিত করেন। তারপর আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।'[৮৯]

এই আয়াতগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে তাঁর আয়াতসমূহ তিনিই সংরক্ষণ করবেন। তিনিই সেগুলোকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন। তার সাথে অন্য কিছু মিশিয়ে ফেলতে দেবেন না। তার মধ্যে কোনো পরিবর্তন করতেও দেবেন না। আর রসূলের সুন্নাত কুরআনের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা। কুরআনের চতুস্পার্শ্বেই তার আবর্তন এবং কুরআনের অর্থের মধ্যে তা প্রত্যাগমন করে। কুরআন ও সুন্নাহ পরস্পরকে সাহায্য করে এবং পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। মহান আল্লাহ বলেন :

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম আর ইসলামকে তোমাদের দীন হিসাবে মনোনীত করলাম।'[৯০]

কুরআন ও সুন্নাহ, এ দুটি হচ্ছে দীনের উৎস। এ দুটির মাধ্যমে দীনের মূলনীতি ও শাখা প্রশাখাগুলো পূর্ণতা লাভ করেছে। পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব সমূহে যেভাবে বিকৃতি সাধিত হয়েছে কুরআনে তেমন বিকৃতির কোনো পথ নেই। সেগুলো বিকৃত হয়েছে কিন্তু কুরআন এ থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ। এর মধ্যে একটি হরফ বা শব্দ বাড়ানো বা কমানোর ক্ষমতা কোনো মানুষের বা জিনের নেই। আল্লাহ্ এর সংরক্ষণের এমন ব্যবস্থা করে রেখেছেন যে, 'কেউ যদি এর মধ্যে একটু সামান্য কিছু পরিবর্তনের প্রচেষ্টা চালায় তাহলে আরব থেকে আজম পর্যন্ত বিস্তৃত সারা বিশ্বের হাজারো লাখো শিশুরাই (অর্থাৎ হাফেযে কুরআন) একে বানচাল করে দেবে।

জনৈক আলেমকে জিজ্ঞেস করা হলো, তাওরাতের অনুসারীদের জন্য তার মধ্যে পরিবর্তন আনা কেমন করে বৈধ হলো অথচ কুরআনের অনুসারীদের জন্য তা বৈধ হলো না কেন ? জবাবে তিনি বললেন : এর কারণ আল্লাহ আহলি কিতাবদের সম্পর্কে বলেছেন,

'কারণ তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের রক্ষক করা হয়েছিল।' [১০ক] তাওরাত সংরক্ষণের দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পণ করা হয়েছিল এবং তারা তার মধ্যে পরিবর্তন সাধন করেছিল। অন্যদিকে কুরআনে আল্লাহ বলেছেন :

'আমিই কুরআন নাযিল করেছি এবং আমিই তার সংরক্ষণকারী।'[১১] এখানে কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ নিজেই গ্রহণ করেছেন, কাজেই এর মধ্যে পরিবর্তন আনার কোনো পথই নেই।

যুগের শ্রেষ্ঠ অলংকারবিদ সাহিত্যিকগণ এর একটি সূরার অনুরূপ বাক্যাবলী রচনা করতেও অক্ষমতা প্রকাশ করেছেন। শয়তানদেরকে তা আড়ি পেতে শোনা থেকে বিরত রাখা হয়েছে। এসবই এর সংরক্ষণের সাথে সম্পর্কিত। কিয়ামত পর্যন্ত এ সংরক্ষণ ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে। পরিবর্তন ও পরিবর্ধন থেকে শরীয়তকে রক্ষা করার ভাবধারাও এরি মধ্যে নিহিত রয়েছে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি : রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানা থেকেই একটি সাক্ষ-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত হয়ে গেছে। উম্মতের জন্য শরীয়তের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মহান আল্লাহ অত্যন্ত শক্ত করে তৈরি করে দিয়েছেন। সংক্ষেপে ও বিস্তারিতভাবে এই প্রতিরক্ষা হচ্ছে : আল্লাহ পূর্ব থেকেই কুরআন কণ্ঠস্থ করার ব্যবস্থা করেছেন। সারা দুনিয়ার সব দেশের মুসলমানদের মধ্যে এর প্রচলন হয়েছে। বড় ছোট নির্বিশেষে সব বয়সের লোকই কুরআন হিফয করেছে। কুরআনের ভিত্তিতে যে শরীয়ত রচিত হয়েছে তা অধ্যয়ন করার জন্য বিভিন্ন লোক এগিয়ে এসেছে এবং তারা সেগুলো কণ্ঠস্থ ও আত্মস্থ করেছে। প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত বিপুল সংখ্যক লোক আরবী ভাষা, সাহিত্য ও জ্ঞান অধ্যয়ন ও চর্চা করে চলেছে। অনুরূপভাবে একদল লোক কুরআন ও হাদীসের ভাষা ও জ্ঞান অধ্যয়ন করে শব্দ ও অর্থের দুর্বলতা তার মধ্যে প্রবেশ করতে দেয় নি। আর আরবী ভাষা জানা শরীয়তের জ্ঞানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চাবিকাঠি। কারণ আল্লাহ

আরবী ভাষায় এ জ্ঞান তাঁর রসূলের স. নিকট অহী করেছেন। তারপর মহান আল্লাহ একদল গবেষক ও ভাষাবিদ নিয়োগ করেছেন। তারা এর ব্যাকরণ ভিত্তিক যাবতীয় বাক্যের ও শব্দের আক্ষরিক বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করেছেন।

এগুলো ছাড়াও বিদআতী, অবিশ্বাসী, নাস্তিক ও সত্যভ্রষ্ট কামনার পূজারীদের চক্রান্তের হাত থেকেও আল্লাহ একে বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেছেন। এ জন্য আল্লাহ তাঁর একদল সৈনিক তৈরি করেছেন। তারা আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রসূলের সুন্নাত হৃদয়ংগম করেছেন। কুরআনে ও সুন্নাতে শরীয়তের উদ্দেশ্য ও লক্ষ নির্ণয় করে তার অর্থ অনুধাবন করেছেন এবং তার ভিত্তিতে সেখান থেকে বিস্তারিত বিধান উদ্ভাবন করেছেন– কখনো আল্লাহ ও রসূলের বাণীর নিষেধাজ্ঞা থেকে কখনো তার অন্তরনিহিত অর্থ থেকে, আবার কখনো হুকুমের কার্যকারণ থেকে। ঘটনাবলীকে তারা এমনভাবে সন্নিবেশিত করেছেন যার ফলে যার মধ্যে কোনো নসের হুকুম পাওয়া গেছে তাকে প্রত্যাখ্যান করা হয় নি। এভাবে পরবর্তীকালে আগতদের জন্য এ পদ্ধতিকে সহজ করে গেছেন। অনুরূপভাবে তারা শরীয়তের জ্ঞানের যথার্থ অনুধাবন ও অনুশীলন যে সমস্ত ইলম ও শাস্ত্রের ওপর নির্ভরশীল তার প্রত্যেকটির মধ্যে এ পদ্ধতি জারী করেছেন। এমন কি আরবী হস্তলিপি বিদ্যা যা শরীয়তের ইলম প্রকাশে সহায়তা করে তাকেও এভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন।[৭২]

অনুবাদ- আবদুল মান্নান তালিব

প্রমাণপঞ্জি

৬৭. সূরা আস সাবা, ২৮ আয়াত।
৬৮. সূরা আল আ'রাফ, ১৫৮ আয়াত।
৬৯. বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযী।
৭০. সূরা আল মায়েদা, ৬৭ আয়াত।
৭১. আল মাওয়াফিকাত, ২য় খণ্ড, ২৪৬ পৃষ্ঠা এবং ই'লামুল মুকিয়ীন, ১ম খণ্ড , ৩০৫ পৃষ্ঠা।
৭২. তাঁর পুরো নাম হচ্ছে : আবদুল মালিক ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ আল জাওয়াইনী আবুল মা'আলী। তিনি শাফেয়ী মাযহাবের পরবর্তীকালের শ্রেষ্ঠতম ইমাম। নিশাপুরের উপকণ্ঠে জাওয়াইনে তাঁর জন্ম হয়। সেখান থেকে তিনি বাগদাদে চলে আসেন এবং তারপর সেখান থেকে মক্কায় এবং তারপর মদীনায়। তিনি শিক্ষকতা শুরু করেন এবং ফাতোয়া দেবার দায়িত্বও পালন করেন তারপর নিশাপুরে ফিরে আসেন। প্রধানমন্ত্রী নিযামুল মুলক তাঁর জন্য তৈরি করেন মাদরাসা নিযামিয়া। ৪৭৮ হিজরীতে নিশাপুরেই তিনি ইন্তিকাল করেন। দ্রষ্টব্য ওয়াফিয়াতুল আ'ইয়ান, ১ম খণ্ড, ২৮৭ পৃষ্ঠা।
৭৩. দ্রষ্টব্য, জামে আযহার লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত দলীলপত্রাদি, ৯১৩ নম্বর দলীল, সূরা আল আহযাব, ৩৭ আয়াত।
৭৪. সূরা আল আহযাব, ৩৭ আয়াত।

৭৫. আল মাওয়াফিকাত, ২য় খণ্ড, ২৪৬-২৪৭ পৃষ্ঠা।
৭৬. আল মাওয়াফিকাত, ২য় খণ্ড, ২৪৭ পৃষ্ঠা।
৭৭. আল মাওয়াফিকাত, ২য় খণ্ড, ২৪৮ পৃষ্ঠা।
৭৮. ইগাছাতুল লাহফান নাফ্লান আন তা'লীলিল আহকাম, মুহাম্মদ শালবী, ৩১৯-৩২০ পৃষ্ঠা।
৭৯. আল মাওয়াফিকাত, ২য় খণ্ড, ২৮৫ পৃষ্ঠা।
৮০. সূরা আল কাসাস, ৭৭ আয়াত।
৮১. তাফসীর আল কুরতুবী, ১৩ খণ্ড, ২১৪ পৃষ্ঠা।
৮২. আল মাওয়াফিকাত, ২ খণ্ড, ৩৬৪-৩৬৭ পৃষ্ঠা।
৮৩. নাসের, ইনসাইক্লোপিডিয়া, ইসলামী ফিক্‌হ সংক্রান্ত।
৮৪. বেশি বুদ্ধিদীপ্ত অথবা বেশি সুস্পষ্ট।
৮৫. উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে একদল বর্ণনাকারী এটি বর্ণনা করেছেন, নাইলুল আওতার, ৮ খণ্ড, ২৮৮ পৃষ্ঠা।
৮৬. সূরা আল হাজার, ৯ আয়াত।
৮৭. সূরা হূদ, ১ আয়াত।
৮৮. সূরা ফুসসিলাত, ৪২ আয়াত।
৮৯. সূরা আলহাজ্জ, ৫২ আয়াত।
৯০. সূরা আল মায়েদা, ৩ আয়াত।
৯০ক. সূরা আল মায়েদা, ৪৪ আয়াত।
৯১. আল মাওয়াফিকাত, ২য় খণ্ড, ৫৮-৫৯ পৃষ্ঠা, কুরতুবী, ১০ খণ্ড, ৬০৫ পৃষ্ঠা এবং হাশিয়াতুল জামাল, ২য় খণ্ড, ৬০৬ পৃষ্ঠা।
৯২. আল মাওয়াফিকাত, ২য় খণ্ড, ৫৯ পৃষ্ঠা এবং মুস্তফা সাব্বায়ী লিখিত আসসুন্নাতু ওয়া মাকামাতুহা ফিততাশরী, ৮৯ পৃষ্ঠা।

ইসলামে সুন্নাহর গুরুত্ব

আল্লামা ইবনে কাইয়েম

[বক্ষমান নিবন্ধটি আল্লামা হাফিয ইবনে কাইয়েমের র. বিখ্যাত গ্রন্থ ই'লামুল মু'কেঈন' এর প্রথম খণ্ডের একটি অংশ। এখানে আলোচনার প্রথমাংশের কিছু অংশ বাদ দিয়ে অনুবাদ করা হয়েছে।]

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর এবং রসূলের নির্দেশ মান্য কর আর তোমাদের মধ্যে যারা ক্ষমতার অধিকারী তাদের নির্দেশও মান্য কর। তোমরা যদি কোন বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়ে পড় তাহলে তা আল্লাহ ও রসূলের নিকট উপস্থাপন কর, যদি তোমরা আল্লাহ ও কেয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক।' (সূরা নিসা-৫৯)

উপরে বর্ণিত আয়াতে আল্লাহ তাআলা 'ইতায়াত' তথা মান্য করার কথা নিজের বেলায় যেমন বলেছেন তাঁর রসূলের ইতায়াত করার প্রতিও অনুরূপ নির্দেশ করেছেন। আল্লাহ তালার অনুসরণ বা নির্দেশ মানার সাথে সাথে রসূল স.কেও একই শব্দের অধীনে উল্লেখ না করে দ্বিতীয়বার একই শব্দ প্রয়োগের দ্বারা এটাই বোঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলার নির্দেশ মেনে চলার পাশাপাশি রসূলের নির্দেশও মেনে চলতে হবে সমান গুরুত্ব দিয়ে। আল্লাহর প্রতিটি নির্দেশ মুমিনের জন্যে মেনে চলা যেমন অপরিহার্য অনুরূপ রসূল স. এর নির্দেশও মেনে চলা মুমিনের অবশ্য কর্তব্য। রসূল স.-এর নির্দেশ কুরআনে উল্লেখ না থাকলেও মেনে চলা অপরিহার্য। কারণ আল্লাহ তাআলা নবী করীম স. কে কুরআন দিয়েছেন যা 'ওহীয়ে মাত্‌লু 'পঠিত ওহী'র অন্তরভুক্ত আর অপরটি দিয়েছেন 'ওহীয়ে গায়রে মাত্‌লু' অপঠিত ওহী যা সুন্নাহ তথা তাঁর পবিত্র মুখ নিসৃত বাণী কর্ম ও সম্মতির সমন্বিত রূপ।

আল্লাহ তাআলা ইতায়াতের (মান্য করার) ব্যাপারে 'উলিল আমর' ক্ষমতার অধিকারী এর বেলায় একাধিক 'আতিউ' শব্দ ব্যবহার করেননি, বরং উলিল আমরকে একই আতিউ শব্দের অন্তরভুক্ত করে দিয়েছেন। এর কারণ হলো, 'উলিল আমর'দের মান্য করার ব্যাপারটি আল্লাহ ও রসূলের মতো শর্তহীন নয় বরং শর্তাধীন। এর সারকথা হলো, মানুষ উলিল আমর-এর অনুসরণ করবে তবে এ অনুসরণ রসূলের অনুসরণের অধীনে হতে হবে। উলিল আমরগণ মানুষকে তাদের আনুগত্য করতে বাধ্য করতে পারবে না। রসূলের আনুগত্যের আওতাধীন হওয়ার কারণে উলির আমরের আনুগত্য প্রকারান্তরে রসূলের আনুগত্য হিসেবেই বিবেচিত হবে।

লেখক। আল্লামা ইবনে কাইয়েম সপ্তম হিজরীর শেষার্ধে দামেশকে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৭৫১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। তিনি ছিলেন ইমাম ইবনে তাইমিয়ার প্রধানতম শাগরিদ, অনেকগুলো যুগান্তকারী গ্রন্থ প্রণেতা। অষ্টম হিজরীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক ও বুদ্ধিজীবী হিসাবে তিনি পরিচিত।

রসূল স. এর আনুগত্যের ভিত্তিতে উলির আমরগণ যে নির্দেশ দিবেন তা মান্য করা আবশ্যিক কিন্তু উলির আমরের নির্দেশ যদি রসূল স.-এর আনুগত্যের পরিপন্থী হয় তবে তা মান্য করা জরুরী তো নয়ই বরং অমান্য করাই জরুরী।

এ প্রেক্ষিতে রসূল স. ইরশাদ করেন, 'খালেক তথা স্রষ্টার নাফরমানী হয় এমন কোনো ব্যাপারে সৃষ্টি তথা মাখলুকের আনুগত্য করা যাবে না।'

এ ক্ষেত্রে তিনি মূলনীতিও বলেছিলেন- 'কেউ যদি আল্লাহর নাফরমানী হয় এমন কোন কাজের নির্দেশ দেয় তাহলে তা শোনা এবং মানা যাবে না।'

একদল সাহাবীর আগুনে আত্মাহুতি দেয়ার সংকল্পের কথা যখন রসূল স. এর কাছে বলা হলো, তখন ঘটনা শুনে তিনি ইরশাদ করেন, 'এরা যদি তাদের নেতার নির্দেশে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মাহুতি দিতো তাহলে তাদের অনাদিকাল আগুনেই থাকতে হতো, তাদেরকে আগুন থেকে বের করে আনার ব্যবস্থা হতো না। যদিও তাদের আগুনে আত্মাহুতি দেয়া ছিল আমীরের (উলিল আমরের) আনুগত্যের প্রতিফলন। আমীরের নির্দেশ মান্য করাকে তখন তারা দীনের আবশ্যিক বিষয় মনে করেছিল। [১]

রসূল স. তাদের ব্যাপারে এই হুঁশিয়ারী এ জন্য উচ্চারণ করেছিলেন যে, তারা উলিল আমরের নির্দেশের তাৎপর্যকে কুরআনে কারীমের নির্দেশের আলোকে যাচাই করেনি, ভেবে দেখেনি উলিল আমরের এ নির্দেশ আল্লাহ তাআলার নির্দেশের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। বস্তুত উলিল আমরের নির্দেশ পালন করতে গিয়ে তারা আল্লাহর সুস্পষ্ট নির্দেশ লঙ্ঘন করার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিল। এবং উলিল আমরের আনুগত্যের সীমাকে তারা এতোটা বিস্তৃত করে ফেলেছিল যা শরীয়ত প্রবর্তকের আনুগত্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী ছিল। এমন

টীকা ১ :

আল্লামা ইবনে কাইয়েম তার লিখিত গ্রন্থ 'যাদুল মা'আদ'-এ এই ঘটনাটি বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফেও হযরত ইবনে আব্বাস রা. সূত্রে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনাটি এমন- উপরে উল্লেখিত সূরা নিসা-এর ৫৯ নং আয়াতটি আবদুল্লাহ ইবনে হুযায়ফা আসসামী সম্পর্কে নাযিল হয়। রসূল স. তাকে আনসারদের একটি দলের নেতৃত্বের দায়িত্ব দিয়ে অভিযানে প্রেরণ করেন। অভিযাত্রীদের বিদায় লগ্নে নবীজী স. ইরশাদ করেন, 'তোমরা সবাই আমীরের আনুগত্য করবে।' দলের অন্যারা কোন কারণে আবদুল্লাহ ইবনে হুযায়ফাকে অসন্তুষ্ট করে ফেলে। ফলে দল নেতা আবদুল্লাহ ইবনে হুযায়ফা তাদেরকে লাকড়ী জড়ো করার নির্দেশ দেন। লাকড়ী জড়ো করার পর সহকর্মীদের উদ্দেশে দলনেতা বললেন, রসূল কি তোমাদেরকে আমার নির্দেশ মানার জন্যে বলেন নি? সবাই একবাক্যে বলল, হ্যা, তিনি আমাদেরকে আপনার নির্দেশ মানার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। তখন দলনেতা আবদুল্লাহ বিন হুযায়ফা বললেন- তোমরা জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়।

এ নির্দেশ শুনে সবাই অবাক হয়ে একে অন্যের প্রতি তাকাতে লাগল এবং বলল- 'আগুনের ভয়ে পালিয়ে এসেই তো আমরা রসূল স. এর কাছে আশ্রয় নিয়েছি।'

এ কথা শুনে তাদের প্রতি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হুযায়ফার ক্ষোভ প্রশমিত হয়ে গেল এবং তিনি আর তাদের প্রতি কোন বিরূপ আচরণ করেন নি। এ কাহিনী জানানো হলে রসূল স. বললেন, তারা যদি আগুনে আত্মাহুতি দিতো তাহলে আর তাদের রক্ষা করার কোনো উপায় থাকত না।'

একটি নির্দেশ পালনের আগে তারা বিষয়টি শরীয়ত প্রবর্তকের আনুগত্যের নিক্তিতে পরখ করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেনি। কোন সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ ছাড়াই তারা নিজেদেরকে আল্লাহর গযবে নিক্ষেপ করার জন্যে উৎসাহী হয়ে উঠেছিল।

ঘটনাটি ছিল এমন একটি ভুল যে ভুলে তাদের সংকল্পে কোন প্রকার অন্যায়ের সংমিশ্রন ছিল না, তাদের লক্ষ ও উদ্দেশ্যে কোন ত্রুটি ছিল না বরং নির্দেশ পালনের মতো একটা সুন্দর আবেগ ছিল তাদের আগুনে আত্মাহুতি দেয়ার প্রেরণা। এমন কর্মও যদি মান্যকারীকে জাহান্নামী সাব্যস্ত করতে পারে তাহলে যারা আল্লাহ ও রসূলের সুস্পষ্ট নির্দেশকে নির্বিবেচনায় লঙ্ঘন করে তাদের পরিণতি কি হতে পারে তা অনুধাবন করা কোনো কঠিন ব্যাপার নয়।

আল্লাহ তাআলা মুমিনদের প্রতি ইরশাদ করেন, 'তারা যদি কোন ব্যাপারে মতবিরোধে লিপ্ত হয়ে পড় তাহলে তারা যেন সেটিকে আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের নিকট উপস্থাপন করে, তার মধ্যেই রয়েছে তাদের দুনিয়ার ও আখেরাতের সাফল্য।'

এ আয়াতটি চিন্তা ও কর্মের অসংখ্য জটিলতা নিরসনের পথ উন্মোচন করেছে। তন্মধ্যে–

১. ঈমানদারদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিতে পারে কিন্তু কোন মতবিরোধ তাদেরকে ইসলামের সীমারেখার বাইরে নিয়ে যায় না।

২. সাহাবায়ে কেরাম উম্মাহর মধ্যে সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক পবিত্র সত্তার অধিকারী। উম্মতের পরবর্তী যুগের কোনো দল তাদের মতো শক্তিশালী ঈমানের অধিকারী হতে পারবে না। সর্বোচ্চ ঈমানের অধিকারী হওয়ার পরও কোনো কোনো সময় তাদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু তাদের দ্বন্দ্ব ও মতবিরোধ ছোটখাটো প্রাসঙ্গিক বিষয়াদির মধ্যে সীমিত ছিল, দীনের মৌলিক বিষয়ে তাদের মধ্যে কোন ধরনের মত পার্থক্য ছিল না।

আল্লাহ তাআলার পবিত্র নাম, গুণ ও কর্ম সম্পর্কে সকল সাহাবী কুরআন হাদীস সমর্থিত মতই পোষণ করতেন। আল্লাহ ও রসূল এর পক্ষ থেকে যেসব ব্যাপারে পরিষ্কার নির্দেশ রয়েছে সেসব ব্যাপারে কোনো ধরনের বুদ্ধির ঘোড়া দৌড়ানোকে তাঁরা মোটেও প্রশ্রয় দিতেন না। শব্দের অর্থ ও মর্ম ওলটপালট করে বুদ্ধি বিচার ও চাহিদা মতো শরীয়তের সুনির্দিষ্ট বিষয়ে কোনো প্রকার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তাঁরা কখনো করেননি। কোনো জিনিসকে তার প্রকৃত অবস্থা থেকে নিজেদের মর্জি মতো বেশি মর্যাদা দিয়ে মনের চাহিদা পূরণ করাকে সাহাবায়ে কেরামের পবিত্র আত্মা কখনো সায় দিতো না। কুরআন ও সুন্নাহ রূপে শরীয়তের যে কাঠামো তাঁরা পেয়েছিলেন পুঙ্খানুপুঙ্খ সেটিকে তাঁরা রপ্ত করেছিলেন। শরীয়তের মধ্যে তাঁরা কখনো নিজের রুচি মর্জির অনুপ্রবেশ ঘটাননি। সাহাবায়ে কেরামের পবিত্র সত্তা ছিল সেইসব ইচ্ছাদাসদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী যারা দীনকে নিজেদের ইচ্ছামতো কেটে ছেঁটে টুকরো টুকরো করেছে এবং যে ক্ষেত্রে নিজেদের চাহিদা পূরণের সুযোগ দেখেছে তাই গ্রহণ করেছে এবং দীনের যেসব ক্ষেত্রে জাগতিক স্বার্থের ক্ষতির আশংকা দেখেছে নির্বিচারে দীনের সেই অংশ প্রত্যাখ্যান করেছে।

ঈমানদারদের মতবিরোধ দুনিয়া পূজারীদের মতবিরোধ থেকে ভিন্ন। ঈমানদারদের কোনো মতবিরোধই তাঁদের ইসলামের সীমারেখা লঙ্ঘনের কারণ হয় না। কারণ মত ভিন্নতা সত্ত্বেও শরীয়তের পবিত্র বন্ধন তাদেরকে চিন্তা ও কর্মে অভিন্ন সূত্রে বেঁধে রাখে।

ঈমানদারদের মধ্যে যদি কোনো ব্যাপারে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়, তবুও ঈমান তাদের মতবিরোধ জনিত শূন্যতা প্রতিরোধ করে কুরআন ও সুন্নাহর সিদ্ধান্তের কাছে নতি স্বীকার করে সুদৃঢ় ঐক্য অটুট রাখতে উদ্বুদ্ধ করে। অবশ্য ঈমানদারগণ যদি মতভিন্নতার প্রশ্নে কুরআন সুন্নাহকে মীমাংসাকারী মানতে অস্বীকার করে তাহলে ঈমান থাকা সত্ত্বেও তারা বেঈমানদের পর্যায়ভুক্ত বলে বিবেচিত হয়। কারণ পবিত্র কুরআনে পরিষ্কার ঘোষণা এসেছে–

'কোন ব্যাপারে যদি তোমাদের মধ্যে মতভিন্নতা দেখা দেয় তাহলে তা আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের কাছে উপস্থাপন করো, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো।'

ঈমানদার হওয়ার শর্ত হলো মুমিন তার সব কিছু আল্লাহ ও রসূলের দিকে প্রত্যার্পণ করবে। এটা ঈমানের একটি মৌলিক শর্ত। ইসলামী শরীয়ার মৌল বিধান হলো, কোনো হুকুম যদি কোনো শর্তের সাথে যুক্ত থাকে তবে শর্তের অবর্তমানে শর্তযুক্তেরও অস্তিত্ব থাকে না।

উল্লেখিত আয়াতে 'শা'য়' শব্দটির অনির্দিষ্ট প্রয়োগে এ বিষয়টিই নিশ্চিত করা হয়েছে যে, মুমিনের সকল কাজকর্ম কিতাব ও সুন্নাহর নির্দেশিত পন্থায় সম্পাদিত হতে হবে। সেটি মুমিন জীবনের মৌলিক বিষয়ই হোক বা দৈনন্দিন জীবনের বিষয়ই হোক। আভ্যন্তরীণ বিষয় হোক বা বাহ্যিক হোক। কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাহ যদি মানুষের সার্বিক জীবনে বিস্তৃত না হতো তাহলে আল্লাহ তাআলা এ নির্দেশ দিতেন না যে, 'তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দিলে আল্লাহ ও রসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করো।'

আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাহ যেহেতু মুমিন জীবনের সব কিছুতেই প্রযোজ্য, তাই মুমিনের সকল কাজকর্মকেই আল্লাহ ও রসূলের নির্দেশের ভিত্তিতে পরখ করতে হবে যাতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাহর নির্দেশ প্রতিপালন করা সম্ভব হয়। বস্তুত উল্লেখিত আয়াতে অনির্দিষ্ট বিষয়ের উল্লেখ করার দ্বারা ইসলামী শরীয়ার ব্যাপ্তিকে গোটা জীবনের জন্য কার্যকর করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনের বর্ণনারীতি পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, মুমিনদের মতপার্থক্য জনিত বিষয় আল্লাহ তাআলার প্রতি প্রত্যার্পণ করার মর্মার্থ হলো কুরআন করীমের ফয়সালা অনুধাবন করা আর রসূলের প্রতি প্রত্যার্পণ করার অর্থ হলো, রসূল যতোদিন দুনিয়াতে বর্তমান ছিলেন ততোদিন তাঁকেই মুমিনের সর্ব বিষয়ে ফয়সালাদাতা মান্য করা এবং তাঁর অবর্তমানে তাঁর রেখে যাওয়া সুন্নাহর ভিত্তিতে ফয়সালা করা। কুরআন ও সুন্নাহর সিদ্ধান্ত সর্বান্তকরণে মেনে নেয়ার ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে কোনো মতভিন্নতা নেই, এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ঐকমত্য রয়েছে।

কুরআন ও সুন্নাহ মুসলমানের সার্বিক জীবন ও কর্মের নীতি নির্ধারক, এটি ঈমানের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। কোনো মুসলমান যদি ইলম ও আমলের এ দু'টি মৌলিক উৎসকে নীতি নির্ধারকের মর্যাদা দিতে অস্বীকার করে তবে তার ঈমানদার হওয়ার দাবী সম্পূর্ণ অর্থহীন। ঈমান এবং আল্লাহ ও রসূলের প্রতি নি:শর্ত আনুগত্য সমার্থক। একটির অবর্তমানে অন্যটির অস্তিত্ব থাকে না।

আল্লাহ তাআলা উক্ত আয়াতেই বলেছেন, কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে মুসলমানের সার্বিক কাজকর্ম সম্পাদন করার মধ্যে দুনিয়া ও আখেরাতের সাফল্য নির্ভরশীল। এরপর এ বিষয়টিও পরিষ্কার করে দেয়া হয়েছে, যেসব লোক সর্ব বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহকে সর্বোচ্চ অথরিটি জ্ঞান করে না, কুরআন ও সুন্নাহ এড়িয়ে অন্য কোনো চিন্তা, মতাদর্শের কাছে তাদের মতভিন্নতার বিষয় প্রত্যার্পন করে তারা মুখে মুখে মুসলমান হওয়ার দাবী করলেও প্রকৃত আল্লাহর বান্দা নয়, তাগুতের বান্দা। কারণ তারা তাগুতকেই তাদের ফয়সালাদাতা মেনে নিয়েছে।

তাগুত হলো, সেই সব লোকগোষ্ঠী বা মতাবলম্বী যারা আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য না করে প্রবৃত্তির আনুগত্য করে। তাগুত শব্দটির অর্থ খুবই ব্যাপক। যেসব বিষয়ে মানুষ আল্লাহ ও রসূলকে পরিহার করে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, ইজম, বাতিল চিন্তা ও মতবাদকে সিদ্ধান্তদাতা বলে মেনে নেয় সেই সব বিষয়ই তাগুতের অন্তরভুক্ত। আল্লাহ ও রসূল থেকে মুখ ফিরিয়ে মানুষ যাদের আনুগত্য করে তাদেরকেই তাগুত বলে অভিহিত করা হয়। আল্লাহ ও রসূলকে অমান্যকারী লোকদের গলায় তাগুতের গোলামীর রশি বেঁধে দেয়া হয়েছে।

আপনি যদি একটু গভীর অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে সমাজের দিকে তাকান তাহলে দেখতে পাবেন, সমাজের অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য পরিহার করে তাগুতের তাবেদারি করছে। অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ বিশ্বাসের দাবী করে, আখেরী নবী স. এর প্রতি ঈমান রাখার দাবীও করে বটে কিন্তু তাদের এ দাবীতে কোন ধরনের সত্যতা ও বস্তুনিষ্ঠতা নেই। কারণ বাস্তবে তারা তাগুতেরই আনুগত্য করে, তাগুতের বন্দেগী করে। তাদের জীবনে যখনই কোনো বিষয়ে ফয়সালার প্রয়োজন হয় তখন তারা আল্লাহ ও রসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করার পরিবর্তে তাগুতের চৌকাঠেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে। বস্তুত এসব হতভাগারা হিদায়াতের পথ খুইয়ে ফেলেছে। তাগুতের অনুসারীরা দুনিয়ায় সাফল্যের পথে চলার জন্য সচেষ্ট হয়। সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন ও পবিত্র মনের অধিকারী লোকজন রসূলের প্রদর্শিত যে পথে চলেছেন, তাগুতের অনুসারীরা দুর্ভাগ্যবশত জীবনের লক্ষ ও উদ্দেশ্য অর্জনে তাদের পথ থেকে বিচ্যুত।

আল্লাহ তাআলা এসব পথভ্রষ্ট লোকদের চিন্তা ভাবনা ও কাজ কর্ম সম্পর্কে বলেন, যখন আল্লাহ ও রসূল স. এর দিকে তাদের কাজ কর্ম প্রত্যার্পণের কথা বলা হয় তখন তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং আল্লাহর পথে আহ্বানকারীদের কথা না শোনার ভান করে। তারা আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করার পরিবর্তে অন্যদের নির্দেশ পালন করে। এসব জালেম

আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্যে সন্তুষ্ট হতে পারে না। তাগুতের আনুগত্যে গর্ব অনুভব করে। মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে তাগুতের ফয়সালা মেনে নিয়ে স্বস্তি বোধ করে। তাদের বিকৃতি ও বিভ্রান্তির ফলে যখন আল্লাহর গযব নেমে আসে তখন তাদের মস্তিষ্ক আল্লাহর গযব অনুধাবন করতে পারে না, তাদের জ্ঞান বুদ্ধি বিভ্রান্তির অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে যায়। তাদের দেহমন নিষ্কর্ম এবং তাদের সম্পদ অর্থহীন হয়ে পড়ে। অত:পর কৃত্রিম বিনয়ভাব প্রকাশ করে বলতে থাকে, আমরা কোন খারাপ উদ্দেশ্যে আল্লাহ ও রসূলের প্রতি বিদ্বিষ্ট নই বরং আমাদের উদ্দেশ্য খুবই মহৎ। আমরা চাই এমন একটা পন্থা বের করতে যাতে আল্লাহ ও রসূলকে মান্যকারী ধর্মপরায়ণ ও অধার্মিকদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সহাবস্থানের একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়। নিজেদের ইচ্ছা ও খেয়াল খুশী মতো তারা কল্যাণ ও মঙ্গলজনক পথের ঝাণ্ডাবাহীতে পরিণত হয়। অথচ ইসলামী শরীয়ার দৃষ্টিতে এ ধরনের চিন্তা-ভাবনা খুবই দুর্ভাগ্যজনক।

ঈমানের চাহিদা হলো, প্রত্যেক ঈমানদার ঈমান বিরোধী তথা রসূল আকরাম স. প্রদর্শিত পথ পরিপন্থী সকল বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ থাকবে। সেটি আকীদা বিশ্বাসগত হোক, রাজনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক, একান্ত ব্যক্তিগত কিংবা আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কিতই হোক না কেন। বাতিল কাজ কর্ম, চিন্তা ভাবনার প্রতি ঈমান প্রত্যেক ঈমানদারের মধ্যে ঘৃণাবোধ জন্ম দেয়। এবং বাতিলকে নির্মূল করার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা সাধনা করার অনুপ্রেরণা যোগায়। যেসব লোক হক ও বাতিলের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে সবাইকে খুশী করতে চায় তাদের ঈমান ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। দীনি কাজে সহযোগিতা এবং দীন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা ঈমানদারের জন্য জরুরী। অবশ্য হক ও সত্যের আনুগত্য করতে পারা এবং সত্যের উপর অটল অবিচল থাকতে পারা আল্লাহ তাআলার তৌফিক ছাড়া সম্ভব পর নয়।

আল্লাহ তাআলা তার স্বীয় সত্তার কসম খেয়ে বলেন–

'তারা কখনও মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তাদের মতভিন্নতার বিষয়ে আপনাকে ফয়সালাকারী মানবে। অত:পর আপনি যা ফয়সালা দিবেন, তা একাগ্রচিত্তে না পালন করা পর্যন্ত তারা মুমিন হতে পারবে না।'

উল্লেখিত আয়াতে মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে শুধু রসূল স.কে ফয়সালাকারী মানাকেই ঈমানের শর্ত ঘোষিত হয়নি বরং বলা হয়েছে রসূলের ফয়সালাকে একাগ্রচিত্তে খুশী মনে মেনে নিয়ে সন্তুষ্ট হওয়ার মতো মেজাজ তৈরি করাই ঈমানের দাবী।

রসূলের ফয়সালায় সন্তুষ্ট হওয়া এবং প্রশান্তি লাভ করার ব্যাপারটি তখনই হতে পারে যখন কোন মানুষ রসূলের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা রাখবে। রসূলের নির্দেশ ও উপদেশের প্রতি নি:শর্ত আস্থা রাখবে।

এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন– 'আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোনো কাজের আদেশ করলে কোনো ঈমানদার পুরুষ বা কোনো ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্নমত পোষণের ক্ষমতা নেই। আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আদেশ যারা অমান্য করে তারা

প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত হয়। (সূরা আহযাব) এখানে আল্লাহ্ তাআলা পরিষ্কার ঘোষণা দিয়েছেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ফয়সালার পর যদি কোনো মুসলমান নিজের ইচ্ছামতো ফায়সালা করে তবে সে সরাসরি গোমরাহীতে লিপ্ত হয়।

সূরায়ে হুজুরাতে মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, ' হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও রসূলের সামনে অগ্রণী হয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় করো! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সব কিছু জানেন এবং শুনেন।' (সূরা হুজরাত-১)

এ আয়াতের মর্মার্থ হলো, যতোক্ষণ না রসূল স. কোনো ব্যাপারে ফয়সালা দেন ততোক্ষণ পর্যন্ত তোমরা নীরব থাকো। তোমাদেরকে নবীর প্রতিটি নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করতে হবে এবং তাঁর দেয়া সিদ্ধান্ত মতো সব কাজ সম্পাদন করতে হবে। ঈমান আনার অর্থ হলো, তোমাদের সকল ইচ্ছা অধিকার আহ্লাদ রসূলের কাছে অর্পণ করেছো। এখন তোমাদের কর্তব্য হলো, রসূলের সিদ্ধান্ত মোতাবেক কাজ করা। আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাহকে এড়িয়ে কোন ব্যাপারে তোমরা অগ্রসর হলে তাতে তোমাদের ধ্বংস ও ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী। হযরত ইবনে আব্বাস রা. এ প্রেক্ষিতে এভাবে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন ঃ 'আল্লাহ ও রসূলের কিতাব ও সুন্নাহর পরিপন্থী কোন কথা মুসলমানদের মুখ থেকে কখনো প্রকাশ পাওয়া উচিত নয়। মুসলমানকে সম্পূর্ণ নিষেধ করে দেয়া হয়েছে, তারা যেন রসূলের ফয়সালার আগে নিজেদের পক্ষ থেকে কোনো ফয়সালা দেয়ার ধৃষ্টতা প্রদর্শন না করে।'

ইবনে আব্বাসের একথা উল্লেখিত আয়াতের চমৎকার ব্যাখ্যা। কারণ এটি একটি মৌলিক বিষয় যে, একজন নিজেকে ঈমানদার হওয়ার দাবী করবে অথচ রসূলের সিদ্ধান্তের বাইরে নিজের খেয়াল খুশী মতো সিদ্ধান্তকে প্রাধান্য দেবে।

এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলা আরো ইরশাদ করেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপরে তোমাদের কণ্ঠস্বর উচু করো না। এবং তোমরা একে অপরের সাথে যেরূপ উচ্চস্বরে কথা বলো, তাঁর সাথে সেরূপ উচ্চস্বরে কথা বলো না। এতে তোমাদের আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে, তোমরা তা টেরও পাবে না।' (সূরা হুজুরাত-২)

যে মহান সত্তা সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা ঘোষণা করে দিয়েছেন, ঈমান আনার পর তোমরা তার সামনে উচ্চ স্বরে কথা বলো না। একথাও বুঝিয়ে দিয়েছেন, তোমরা যখন তার পবিত্র দরবারে থাকো, আর কথা বলো তখন মনে রেখো, তোমরা সাধারণ কোনো মানুষের সাথে কথা বলছো না। তোমরা এমন একজন পবিত্র সত্তার সাথে আলাপ করছো, যিনি খুবই সম্মানী। তাঁর সামনে সামান্য উচ্চ কণ্ঠে কথা বলাও তোমাদের আমল বরবাদ হয়ে যাওয়ার কারণ হতে পারে।

এ ক্ষেত্রে আপনি একটু চিন্তা করে দেখুন। রসূল স. এর সাথে কথাবার্তায় সামান্য অসতর্কতাও যদি আমল বরবাদ হওয়ার কারণ ঘটতে পারে তবে প্রতিনিয়ত যারা তাদের বিকৃত চিন্তা ভাবনা কাজকর্ম চলনে বলনে রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করছে, তাদের পরিণতি কিরূপ হতে পারে ?

কুরআনুল কারীম আরো ঘোষণা করেছে,

'মুমিন তো তারাই যারা আল্লাহ ও রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং রসূলের সাথে কোনো সমষ্টিগত কাজে শরীক হলে তাঁর কাছ থেকে অনুমতি ছাড়া চলে যায় না।' (সূরা নূর-৬২)

কুরআনুল কারীম রসূল স. সম্পর্কে মুমিনদেরকে এতোটাই সতর্ক করেছে যে, তাঁর সম্মুখ থেকে উঠতে হলে কিংবা তাঁর সহযাত্রী থাকা অবস্থায় চলে যেতে হলে অবশ্যই তাঁর অনুমতি নিতে যেন কসুর না করে। প্রকৃতপক্ষে এটাই হলো নবুয়তের প্রতি শ্রদ্ধা ও আকীদার চাহিদা। যে ধর্ম তার রসূলের প্রতি এ পর্যায়ের শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছে, যে ধর্ম নবীর মর্যাদার ব্যাপারে এতোটাই নাজুক, সে ক্ষেত্রে যে সব লোক তাঁর নির্দেশ ও নির্দেশিত পথ পরিহার করে তাঁর হুকুমের পরিপন্থী কাজ করবে, তাদের কাজ কর্ম, চিন্তা চেতনা সর্বক্ষেত্রে রসূলের বিরুদ্ধাচরণ প্রতিফলিত হবে, নিজেদের ইচ্ছামতো যারা বিবেকের ঘোড়া দৌড়াবে তার পরও তারা কি নাজাতের প্রত্যাশা করতে পারে ?

বুখারী শরীফে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স থেকে বর্ণিত। নবী করীম স. কে তিনি বলতে শুনেছেন– রসূল স. ইরশাদ করেন, 'আল্লাহ তাআলা তোমাদের যে ইলম দ্বারা ভাগ্যবান করেছেন তা থেকে তোমাদেরকে তিনি বঞ্চিত করবেন না। অবশ্য আলেমদের মৃত্যুর মাধ্যমে ইলম তোমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হবে। অত:পর মূর্খরা অবশিষ্ট থাকবে। লোকজন তাদের সমস্যার সমাধান জানার জন্য মূর্খদের শরণাপন্ন হবে এবং মূর্খরা তাদের মস্তিষ্ক প্রসূত চিন্তার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত দেবে। এসব মূর্খ নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরও পথভ্রষ্ট করবে।'

এ বর্ণনা যখন হযরত আয়েশা রা. এর কাছে পৌছাল তখন তিনি তাঁর ভাগ্নেকে বললেন, 'হে বোনের ছেলে! শুনেছি আবদুল্লাহ ইবনে আমর হজ্জ করতে আসছেন, তুমি তাঁর কাছে গিয়ে এ হাদীসের সত্যতা জিজ্ঞেস করে এসো। কারণ তিনি সরাসরি রসূল স. এর কাছ থেকে উপকৃত হয়েছেন।'

অত:পর উরওয়া ইবনে যুবায়ের শ্রদ্ধেয় খালাম্মার নির্দেশ পালন করার জন্য আবদুল্লাহ ইবনে আমরের শরনাপন্ন হয়ে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করলেন যেসব হাদিসের তিনি একান্ত আমানতদার ছিলেন। আবদুল্লাহ বলেন, আল্লাহ তাআলা যখন তাঁর বান্দাদেরকে ইলমের দৌলতে ভাগ্যবান করেন, তখন আর তা থেকে বঞ্চিত করেন না। তবে উলামায়ে কেরাম যখন দুনিয়া ত্যাগ করেন, তখন তাদের মৃত্যুর সাথে সাথে ইলমও চলে যায়। তখন ফতোয়া বা ফয়সালা দেয়ার ক্ষমতা মূর্খদের হাতে চলে যায়, যারা ইলম বা জ্ঞান ছাড়াই সিদ্ধান্ত দেয়। এরা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হয় এবং অন্যদেরও পথভ্রষ্ট করে।'

হযরত আউফ ইবনে মালিক আল আশজায়ী সূত্রে বর্ণিত। রসূল স. একবার ইরশাদ করেন, আমার উম্মত সত্তরের বেশি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যাবে। তন্মধ্যে বেশি ফিতনা ফ্যাসাদে তারাই জড়িয়ে পড়বে যারা দীনি ব্যাপারে অনুমানের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেবে।

এরা আল্লাহর হারামকৃত জিনিসকে হালাল বলে ফতোয়া দেবে আর যেসব জিনিসকে আল্লাহ হালাল বলেছেন এগুলোকে হারাম বলবে।

আবু আমর ইবনে আবদুল্লাহ এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, এ হাদীসে সেই সব লোকের আলোচনা করা হয়েছে, যারা কুরআন ও সুন্নাহকে মূলনীতি মানার পরিবর্তে নিজেদের জ্ঞান বুদ্ধিকে পথ প্রদর্শক করে নেয় এবং নিজেদের বুদ্ধি বিবেকের মাধ্যমে দীনি বিষয়ে মত ব্যক্ত করে।

হালাল জিনিসগুলো হালাল হওয়ার ব্যাপারে একমাত্র কুরআন হাদীস থেকেই জানতে হবে এবং হারাম জিনিস হারাম হওয়ার ব্যাপারে শুধুমাত্র কুরআন হাদীস থেকেই জানতে হবে। যে সব লোক কুরআন হাদীস অনুধাবন করতে অক্ষম তারা নিজেদের বিচার বুদ্ধি অনুযায়ী হালাল হারাম সম্পর্কেও সিদ্ধান্ত দিতে শুরু করে। এরা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হয় অন্যদেরও পথভ্রষ্ট করে। পক্ষান্তরে যারা ছোটখাট বিষয়েও কুরআন সুন্নাহর ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয় তারা পায় সঠিক পথের দিশা; সঠিক গন্তব্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয় তারা।

যে সব ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহর সুস্পষ্ট কোনো নির্দেশনা নেই, এসব ব্যাপারে কেউ যদি তার বিবেক বুদ্ধিকে ব্যবহার করে কোন সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে এ রায় দোষণীয় হবে না। তবে এ ব্যাপারে রায় প্রদানকারীকে খেয়াল রাখতে হবে তার সিদ্ধান্ত যেন কুরআন ও সুন্নাহর মূল চেতনার পরিপন্থী না হয়।

যে সব ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহর পরিষ্কার দিক নির্দেশনা রয়েছে সেখানে কারো পক্ষে নিজস্ব বিবেক বুদ্ধি খাটিয়ে সিদ্ধান্ত দেয়ার অধিকার নেই। কেউ যদি কুরআন সুন্নাহর সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা থাকার পরও নিজের বুদ্ধির ঘোড়া দৌড়ানোর ধৃষ্টতা দেখায় তাহলে সে রসূল স. এর সেই বিখ্যাত হুঁশিয়ার বাণীর পর্যায়ভুক্ত হবে।

মুসনাদে উবইদা ইবনে হুমাইদে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত; রসূল স. ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছামতো কুরআনের ব্যাখ্যা করলো সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।' অতএব আমরা যারা ঈমানদার হওয়ার দাবী করি, অথচ অনেক ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহ'র পরিবর্তে তাগুতের অনুসরণ করি, তাদের এখনই সতর্ক হওয়া উচিত। আল্লাহ সবাইকে সুন্নাহর আলোকে জীবন গঠনের তৌফিক দিন।

অনুবাদ– আবু শিফা মুহাম্মদ শহীদ

ইসলামী আইনে সূদ : পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

মাওলানা মুখলেসুর রহমান

হযরত আদম আ. থেকে শুরু করে অদ্যাবধি মানুষকে তার জীবন উপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে আল্লাহতাআলা পৃথিবীতে প্রয়োজনীয় সম্পদ ও জীবনোপকরণ রেখে দিয়েছে।

ইসলাম একটি সার্বজনীন আদর্শ। মানব জীবনের সর্ব বিষয়ে সুষ্ঠু ও সুন্দর সমাধান এই জীবন-বিধানে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। মানব জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে ইসলামের নীতিমালা ও দৃষ্টিভঙ্গি চিরকল্যাণ ও স্থায়ী সুফল বয়ে আনে। ইসলামের নীতি ও আদর্শ ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধে থেকে মানব জাতির সামগ্রিক কল্যাণের লক্ষে প্রতিফলিত হয়।

সামাজিক পরিমণ্ডলে ব্যবহারিক জীবনে মানুষ মাত্রই পারস্পরিক লেনদেনে অভ্যস্ত। প্রাত্যহিক চাহিদা ও অভাব মেটানোর স্বার্থে মানুষ স্বভাবতই এই প্রয়োজনকে এড়াতে পারে না। মানব জীবনের এই স্বভাবজাত অপরিহার্য প্রয়োজনকে ইসলাম শুধু স্বীকার করেই ক্ষ্যান্ত হয় নি; এর পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা ও চুলচেরা বিশ্লেষণও করেছে। পাশাপাশি লেনদেনের ক্ষেত্রে যে সব পন্থা ও পদ্ধতি পরিচ্ছন্ন ও কলুষতামুক্ত সর্বোপরি ক্ষতিকর নয় সেগুলোর প্রতি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে।

যেহেতু এই লেনদেন ও আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে মানুষ বৈধ উপায়ে লাভবান হয়, তাই এই লাভের পথ ধরে মানুষ লেনদেনের ক্ষেত্রে এমন কিছু পদ্ধতি ও পন্থা আবিষ্কার করেছে, যা বাহ্যদৃষ্টিতে অতি চমকপ্রদ ও ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে উপকারী মনে হলেও মূলত সামষ্টিকভাবে ক্ষতিকারক। ইসলাম অন্যের ক্ষতি করে নিজে লাভবান হওয়ার সকল প্রক্রিয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। সূদ, ঘুষ, মওজুদদারী, কালোবাজারী, ভেজাল মিশ্রণ এবং জুয়া, লটারী ও বাজি ইত্যাদিসহ অর্থলোভী মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট এমন লেনদেন প্রক্রিয়া, যা সমাজের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর চরম ক্ষতিসাধন করে নিছক এক শ্রেণীর বুভুক্ষু অর্থলিপ্সু মানুষের উদরপূর্তি করে তা ইসলাম পুরোপুরি নিষিদ্ধ করেছে। অবৈধ কারবারসমূহের মধ্যে সূদ সবচেয়ে মারাত্মক ও ব্যাপক ক্ষতিকারক।

সূদ একটি সামাজিক ব্যাধি। দুরারোগ্য ও মরণব্যাধি এইডস যেমন মানবদেহ ও তার সত্তাকে ধ্বংস করে সূদী কারবার তেমনি সমাজ জীবনে অর্থনৈতিক ভারসাম্য ও অর্থের সুষম বণ্টন প্রক্রিয়ায় ভয়াবহ বিপর্যয় ও ধ্বংস ডেকে আনে। সমাজ ধনী ও দরিদ্র এ

লেখক : গবেষক মুদাররিস মাদরাসাতুল মদীনা, ঢাকা।

দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। নিত্য নতুন মানবীয় চাহিদা পূরণে মানুষের পারস্পরিক লেনদেন ও আদান প্রদানের ব্যাপক ও বিস্তৃত অধিকার প্রয়োগকে ব্যাহত করে। মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির হাতে অর্থ কুক্ষিগত হয়ে সমাজে অর্থের অবাধ আবর্তন রুদ্ধ হয়ে যায়। সূদ ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সমাজের মানুষ এক অসম আর্থিক বৈষম্যের শিকার হয়।

সূদ সমাজের অসহায় দরিদ্র মানুষের বঞ্চনা ও বিড়ম্বনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এরা ধনীদের দ্বারা শোষিত, নিপীড়িত ও নিগৃহীত হয়। সূদ সমাজে অশুভ পুঁজিবাদ বিস্তারের পথ সুগম করে। ফলে এর অন্তরালে পুঁজিপতিরা বিশাল অর্থ-সম্পদ ও অঢেল বিত্ত-বৈভবের পাহাড় গড়ে তোলে। আর তাদের বিলাস ভোগের জন্য দরিদ্র জনগোষ্ঠী দারিদ্র্যের যূপকাঠে বলি হয়। ধনী-গরীবের বৈষম্য হয় আকাশচুম্বী। বস্তুত বৈষম্যের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে অসহায় দরিদ্র শ্রেণী ধুঁকে ধুঁকে নিশেষ হয়। মোট কথা সূদ প্রথা এমন জঘন্য ও ঘৃণ্য, যে সমাজে তা চালু হয় সে সমাজে সুষ্ঠু অর্থনীতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যায়। ন্যায় অন্যায়ের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে অর্থ ও সম্পদ হস্তগত করার হীন মানসিকতা চরিতার্থ করার নিমিত্ত মানুষ লাগামহীন ও বেপরোয়া হয়ে ওঠে।

সূদের সংগা : সূদের আরবী প্রতিশব্দ 'রিবা'। যাকে ইংরেজিতে usry বা Interest বলে। এর আভিধানিক অর্থ : অতিরিক্ত, বর্ধিত ইত্যাদি। (আল মু'জামুল ওয়াসীত, আল-মুনজিদ, মিসবাহুল লুগাত) যেমন আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে 'তোমরা অতিরিক্ত যা কিছু প্রদান কর।' (সূরা রূম- ৩৯)

হেদায়ার এক ভাষ্যকারের মতে, ধন সম্পদের লেনদেনের ক্ষেত্রে মালের এমন অতিরিক্ত (প্রদত্ত বা গৃহীত) অংশ যার বিনিময়ে কোন কিছু প্রদান বা গ্রহণ করা হয় না তাই সূদ।'

হেদায়া প্রণেতার মতে, 'লেনদেনের ক্ষেত্রে লেনদেনকারী দুই পক্ষের কোন এক পক্ষ কোনরূপ বিনিময় পরিশোধ না করে শুধু শর্তের ভিত্তিতে যে অতিরিক্ত অংশের মালিক হয়ে থাকে তাকে সূদ বলে।'

আল্লামা ইবনুল আরাবী বলেন, 'রিবার আভিধানিক অর্থ অতিরিক্ত। পবিত্র কুরআনে রিবা বলে ঐ অতিরিক্ত পরিমাণকে বুঝানো হয়েছে, যার বিপরীতে কোন বিনিময় নেই।' (আহকামুল কুরআন, মিসর)

উল্লেখ্য, লেনদেন ও অদল-বদলে বিনিময়হীন কিছু বর্ধিত প্রদান করলে বা গ্রহণ করলেই তা সূদ বলে গণ্য হবে না। বরং সে বর্ধিত অংশ সূদ হওয়ার জন্য শর্ত হলো (হানাফী ফকীহগণের মতে) লেনদেনের জন্য নির্ধারিত দ্রব্য দুটি সমজাতীয় হওয়া।

নগদ টাকা ঋণ দিয়ে ঋণদাতা ঋণগ্রহীতা হতে প্রদত্ত মূলধন ব্যতীত অতিরিক্ত যা কিছু উসূল করে তা যেমন সূদের মধ্যে গণ্য, তেমনি মেপে বা ওজনে বেচা-কেনার প্রচলিত এক প্রজাতির কোন বস্তুর পারস্পরিক লেনদেনের সময় কোন বিনিময় ছাড়া এক পক্ষ অপর পক্ষ হতে যে অতিরিক্ত বস্তু গ্রহণ করে তা সূদের অন্তরভুক্ত।

সূদের প্রকার ভেদ

সূদ সাধারণত দু'প্রকার যথা-

১. রিবা আন নাসিয়া বা মেয়াদী সূদ। একে বাণিজ্যিক সূদও বলে।

২. রিবা আল ফদল বা নগদ লেনদেনে অতিরিক্ত প্রদান জনিত সূদ। একে মালের সূদও বলে।

রিবা আন নাসিয়া বা মেয়াদী ঋণের সূদ

ঋণের ক্ষেত্রে সময়ের ব্যবধানজনিত কারণে মূলধনের উপর ধার্যকৃত যে অতিরিক্ত অংশ প্রদান করা হয় তাকে রিবা আন নাসিয়া বলা হয়। সে ঋণ নগদ অর্থও হতে পারে, পণ্যও হতে পারে। নগদ-বাকী ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বা ঋণের ক্ষেত্রে একজন অপরজন থেকে কোন বস্তু নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে ফেরত দেয়ার শর্তে গ্রহণ করার পর মেয়াদ শেষে শর্ত মোতাবেক অতিরিক্ত যা কিছু প্রদান করে তাকেই রিবা আন নাসিয়া বলে।

ফকীহগণ রিবা আন নাসিয়াকে বিভিন্নভাবে সংগায়িত করেছেন। যেমন-

হাদীসের ভাষ্য মতে,

এমন প্রত্যেকটি ঋণ যা মুনাফা আকর্ষণ করে তাই রিবা (রিবা আন নাসিয়া) (আল্লামা সুয়ূতী র. এর গ্রন্থ, আল জামে আসসাগীর, ৯৪ হাদীস নং-৬৬৩২)

'মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা' গ্রন্থে রিবা আন নাসিয়া বা মেয়াদী সূদের নিম্নোক্ত সংগা প্রদান করা হয়েছে।

একজাতীয় দ্রব্য বা বিভিন্ন জাতীয় দ্রব্যের পারস্পরিক নগদ-বাকী ক্রয় বিক্রয় করা হলে চুক্তির শর্তের ভিত্তিতে সময়ের ব্যবধানজনিত কারণে শরীয়ত সম্মত বিনিময় ছাড়া যে বর্ধিত অংশ প্রদান করা হয় তাকে রিবা আন নাসিয়া বা মেয়াদী ঋণের সূদ বলে।

ইমাম আবু বকর আল জাসসাস (র.) বলেন ,

যে ঋণ আদায়ের একটি মেয়াদ শর্তরূপে থাকে এবং গ্রহীতার উপর মূলধনের চেয়ে বেশি ফেরত দেয়ার শর্ত আরোপিত থাকে তাই রিবা (রিবা আন নাসিয়া) (আহ্কামুল কুরআন- খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৫৫৭)

যেমন এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে ৫০০ টাকা ঋণ হিসেবে প্রদান করল এই শর্তে যে, ঋণ গ্রহীতা নির্দিষ্ট সময়ে যখন ঋণ শোধ করবে তখন ঋণদাতাকে ৫৫০ টাকা প্রদান করবে। অথবা ঋণ পরিশোধের জন্য ধার্যকৃত নির্দিষ্ট মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া পর্যন্ত মূল টাকা ছাড়াই প্রতিমাসে ১০% টাকা হারে অতিরিক্ত প্রদান করে যাবে। তাহলে ৫০০ টাকা বাদে অতিরিক্ত ৫০ টাকা বা ১০% হারে যে বর্ধিত অংশ দেয়া হবে তা সূদ বলে গণ্য হবে। কেন না এর কোন বিনিময় নেই। একই নিয়মে কেউ যদি কাউকে ১০০০ টাকা যৌথ ব্যবসায় মূলধন হিসেবে প্রদান করে এই শর্তে যে, লাভ-লোকসান কি হবে **আমি বুঝি না, আমাকে প্রতি মাসে ১০০ টাকা করে লাভ দিয়ে যেতে হবে। এ ক্ষেত্রেও**

প্রদত্ত মাসিক ১০০ টাকা সূদ হবে। কারণ লাভ-ক্ষতি উভয়টাতে শরীক না হলে তা লভ্যাংশ হবে না; সূদে পরিণত হবে।

যে সব দ্রব্যসামগ্রী মেপে বা ওজন করে লেনদেনের প্রচলন রয়েছে সেগুলোর এক জাতীয় দ্রব্যের পারস্পরিক অদল-বদল করতে হলে উভয় দ্রব্যের পরিমাণ সমান সমান হতে হবে। পরিমাণগত সমতা রক্ষা করা সত্ত্বেও যদি কোন ক্ষেত্রে সমতা বিধান করা না যায়, বরং নগদ বাকী বেচা-কেনা হয় তাহলেও সূদী কারবারে পরিণত হবে। তবে এই মাপ বা ওজনে পরিমাণ নির্ণীত দ্রব্যের ক্ষেত্রে দু'টি ভিন্ন জাতীয় দ্রব্যের যদি পরস্পর লেনদেন হয় তবে তার মধ্যে পরিমাণগত সমতা রক্ষা করা জরুরী নয়। বরং কম-বেশি করা বৈধ হবে। কিন্তু সময়ের ব্যবধানজনিত তারতম্যের কারণে তথা নগদ বাকী বেচা কেনার ফলে যদি অতিরিক্ত নেয়া হয় তা সূদ বলে গণ্য হবে। যেমন, কেউ যদি ১০ কেজি ডাল ২০ কেজি চালের বিনিময়ে নগদ বিক্রি করে তাহলে বৈধ হবে। কিন্তু এ কারবারটাই যদি নগদ বাকিতে সম্পন্ন হয় তাহলে সূদী লেনদেন হবে। অনুরূপভাবে এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির নিকট ৫ ভরি স্বর্ণ বা ১০ ভরি রূপা বিক্রি করল এই শর্তে যে, এই নগদ প্রদত্ত স্বর্ণ বা রূপার মূল্য স্বরূপ এক বছর পর ৫ ভরি স্বর্ণ বা ১০ ভরি রৌপ্য আমাকে প্রদান করবে। তাহলে এটা সূদী লেনদেন হিসেবে গণ্য হবে। কেন না সোনা রূপাকে মুদ্রামূল্য ধরা হয়। আর মুদ্রা কারো হাতে কিছুদিন থাকলে তা দ্বারা ব্যবসা করে সে লাভবান হতে পারে। এ ক্ষেত্রে যে পক্ষ নগদ গ্রহণ করল সে এই সময়ের ব্যবধানের সুবাদে কিছু অতিরিক্ত লভ্যাংশ হাতিয়ে নেয়ার সুযোগ পেল যা অপর পক্ষ পায় নি। সুতরাং এটা সূদী কারবার বলে গণ্য হবে। উল্লেখ্য যে, সূদের এই প্রকারকে জঘন্য ও মারাত্মক গুনাহ বলে অভিহিত করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে একে সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে বিধায় একে 'রিব আল কুরআন'ও বলা হয়। রিবা আন নাসিয়া দ্বারাই সমাজের অসাধু পুঁজিপতিরা অর্থের পাহাড় গড়ে তোলে। দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সম্পদ অত্যন্ত সুকৌশলে শোষণ করে নিজেদের পকেট ভারী করে। ব্যাংক শেয়ার, কারেন্সী ও বীমা সহ আধুনিক অর্থনীতির প্রতিটি সেক্টরকে এই রিবা আন নাসিয়া আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এর গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসা দিন দিন কঠিন হয়ে যাচ্ছে। রিবা আন নাসিয়াকে কুরআন যেমন দৃঢ়তার সাথে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে তেমনি কুরআনের পূর্বে অবতীর্ণ সকল ঐশী গ্রন্থেও এর বিরুদ্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞা পাওয়া যায়। (তাকমিলা, পৃঃ ৫৬৭)

রিবা আল ফদল বা মালের সূদ

রিবা আল ফদল বলা হয় এক জাতীয় দ্রব্যের বা মুদ্রার পারস্পরিক নগদ লেনদেনের ক্ষেত্রে শর্তের ভিত্তিতে এক পক্ষকে অতিরিক্ত প্রদান করা যার বিনিময়ে অপর পক্ষকে কিছু দেয়া হয় না। যেমন কোন ব্যক্তি কাউকে ৫০০ টাকার নোট দিয়ে তার ভাংতি চাইল, আর অপর ব্যক্তি বলল যে, ভাংতি নিলে তোমাকে ৪৯০ টাকা ফেরত দেয়া হবে। এ ক্ষেত্রে টাকা গুণগত ও মানগত দিক থেকে একই জাতীয় হওয়ার কারণে ৪৯০ টাকার সমপরিমাণ বলে গণ্য হবে। আর অতিরিক্ত দশ টাকা ভাংতি প্রদানকারী ব্যক্তি কোন বিনিময় ছাড়াই হাতিয়ে নিল। সুতরাং এই দশ টাকা সূদ হবে।

পুরাতন স্বর্ণ বা রৌপ্যের বিনিময়ে নতুন স্বর্ণ বা রৌপ্যের নগদ ক্রয়-বিক্রয় হলে এবং নতুনের পরিমাণের চেয়ে পুরাতনের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশি হলে অতিরিক্ত অংশ সূদ হিসেবে গণ্য হবে। অনুরূপভাবে যা মেপে কিংবা ওজন করে লেনদেন করা হয়, সে সব দ্রব্যের এক জাতীয় বস্তুর পারস্পরিক লেনদেনে কোনো পক্ষ অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করলে তা সূদ হবে। এমন কি এ ক্ষেত্রে উৎকৃষ্টের সাথে নিকৃষ্টের অদল-বদল হলেও উভয় দ্রব্য সমজাতীয় হওয়ার কারণে তাতে কম-বেশি করলে বর্ধিত অংশ সূদ হবে। কেন না একই শ্রেণীভুক্ত বস্তুর মধ্যে গুণগত ও মানগত দিক থেকে কোন পার্থক্য ও ব্যবধান থাকলে তা ধর্তব্য হবে না। যেমন এক মণ আমন ধানের বিনিময়ে এক মণ ইরি ধান যার মূল্য সমান নয় অদল বদল করতে হলে এক মণ আমন ধান এক মণ ইরি ধানের সাথে অদল বদল করা যাবে। এ ক্ষেত্রে সামান্য কম-বেশি করা হলে, যে পরিমাণ অতিরিক্ত দেয়া হবে বা নেয়া হবে তা সূদ হবে।

'মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা' গ্রন্থে পণ্যের সূদ 'রিবা আল ফদল'-এর নিম্নোক্ত সংগা প্রদান করা হয়েছে।

'একই জাতীয় দ্রব্যের পারস্পরিক ক্রয়-বিক্রয়কালে এক পক্ষ অপর পক্ষকে যা কিছু অতিরিক্ত প্রদান করে তাকে মালের সূদ বলে।

রিবা আল ফদল সম্পর্কে হাদীসের ভাষ্য

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রূপার বিনিময়ে রূপা, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, লবণের বিনিময়ে লবণ লেনদেন করা হলে সে ক্ষেত্রে পরিমাণে সমান সমান হতে হবে এবং নগদ হতে হবে। যে ব্যক্তি বেশি দেবে বা বেশি গ্রহণ করবে সে সূদী কারবারী সাব্যস্ত হবে। এ ক্ষেত্রে সূদ গ্রহীতা ও দাতা উভয়ে সমান অপরাধী। (বুখারী ও মুসলিম) হাদীসে উল্লিখিত ছয় প্রকার দ্রব্যের প্রত্যেকটির ক্ষেত্রেই এক প্রজাতির পারস্পরিক লেনদেন করার সময় কমবেশি করলে বা সমান সমান করে নগদ বাকী বিক্রি করলে তা সূদী কারবার হবে। তবে দুই প্রজাতির দ্রব্যে নগদ লেনদেন হলে পরিমাণে কমেবেশি করা যাবে।

উল্লেখ্য, সূদ হারাম হওয়ার হুকুম শুধু এই ছয় প্রকার দ্রব্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং অন্যান্য দ্রব্যও এ নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়ে। এগুলো বিস্তারিত আলোচনার দাবী রাখে।

জাহেলী যুগে আরবে এরূপ নিয়ম ছিল যে, তারা একে অপরকে ঋণ দেয়ার সময় ঋণদাতা গ্রহীতার উপর মূলধনের উপর অতিরিক্ত অংশ ধার্য করত। অত:পর ঋণ গ্রহীতা নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হলে যদি সূদে আসলে তার ঋণ পরিশোধ করতে না পারত তাহলে ঋণদাতা সূদের অংশকে মূলধনের সাথে যোগ করে সম্পূর্ণ টাকার উপর পুনরায় নির্দিষ্ট হারে সূদ প্রদানের শর্তে ঋণের মেয়াদ বাড়িয়ে দিত। এরূপ করাকে শরীয়তের

পরিভাষায় চক্রবৃদ্ধি সূদ বলা হয়। মেয়াদী সূদ এবং মেয়াদী সূদের উপর চক্রবৃদ্ধি সূদ উভয়ই ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম এবং নিষিদ্ধ। চক্রবৃদ্ধি সূদ সম্পর্কে কুরআনের ভাষ্য- 'হে মুমিনগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সূদ উদরস্থ করো না।' (সূরা আলে ইমরান-১৩০)

সূদ অর্থনৈতিক শোষণ এবং অবৈধ পন্থায় সম্পদ কুক্ষিগত করার একটি জঘন্যতম হাতিয়ার। সূদের অন্তরালে অশুভ পুঁজিবাদ জন্ম নেয় এবং সমাজে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও ভারসাম্য বিলুপ্ত হয়। তাই মহান আল্লাহ তাআলা সূদকে হারাম করেছেন।

ইরশাদ হয়েছে, 'আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্যকে হালাল করেছেন এবং সূদকে হারাম করেছেন।' (সূরা বাকারা : ২৭৫)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ওমর রা. বলেছেন,

সর্বশেষে সূদের আয়াত নাযিল হয়েছে। অত:পর নবীজীর স. ইন্তেকাল হয়েছে, কিন্তু তিনি আমাদের সামনে সূদের নির্দিষ্ট কোনো ব্যাখ্যা পেশ করেন নি। সুতরাং যে নির্দেশ জারি হয়েছে তাকে বহাল রাখ, সকল সন্দেহযুক্ত জিনিস থেকে মুক্ত থাকো। আল্লামা তীবি র. হযরত উমর রা. এর ব্যাখ্যাকে আরো পরিষ্কার করে বলেন,

'আয়াতের নির্দেশ যথার্থ এবং তা বহাল রয়েছে, রহিত হয় নি। এতে কোনো সন্দেহ নেই। এ জন্য নবীজী স. এর কোনো ব্যাখ্যা করেন নি। সুতরাং আয়াতের নির্দেশকে তার স্ব অবস্থানে রাখতে হবে। কোনরূপ সন্দেহ বা সংশয় করা যাবে না। এবং তাকে বৈধ করার জন্যে কূটকৌশলের আশ্রয় নেয়া যাবে না।'

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

'হে মুমিনগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সূদ খেয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।' (সূরা আলে ইমরান -১৩০) হযরত আলী, ইবনে মাসউদ ও জাবের রা. প্রমুখ সাহাবীগণ বর্ণনা করেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূদখোর, সূদদাতা, সূদের হিসাব রক্ষক এবং সাক্ষীদ্বয়কে অভিসম্পাত করেছেন এবং বলেছেন তারা সকলেই সমান অপরাধী। (সূত্র : আল মিসবাহুল মুনীর ফী তাহযীবি তাফসীরি ইবনে কাসীর, পৃষ্ঠা-১৯৭, মুসলিম শরীফ : খণ্ড-৩, হাদীস নং-১২১৯)

বিদায় হজ্বের ঐতিহাসিক ভাষণে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন,

'জাহিলী যুগের প্রচলিত সূদের সমস্ত কারবার আমার এই পদতলে সমাধিস্থ করা হলো। সর্ব প্রথম আমি আমার চাচা হযরত আব্বাসের সূদী কারবারটি বাতিল ঘোষণা করছি।

(সূত্র : আবু দাউদ, খণ্ড-৩, হাদীস নং-৬২৮/মুসলিম শরীফ, আল মিসবাহুল মুনীর পৃষ্ঠা-১৯৬)

সূদের প্রধান দু'টি শর্ত

এখানে প্রনিধানযোগ্য যে, যে কোন বস্তুর লেনদেনই হোক, তাতে দু'টি বৈশিষ্ট থাকলে সূদের প্রশ্ন আসবে, বৈশিষ্ট দুটি নিম্নরূপ :-

১. পণ্য ও মূল্য দুটোই সমশ্রেণীর হওয়া। যেমন (গমের বিনিময়ে গম, ধানের বিনিময়ে ধান ইত্যাদি)

২. পণ্য ও মূল্য দুটোই ওজনে বা পাত্রে পরিমাপিত বস্তু হওয়া। কোন লেনদেনের পণ্যে ও মূল্যে উল্লিখিত বৈশিষ্টদ্বয়ের একটিও যদি না থাকে তবে তাতে কম-বেশি ও নগদ বাকী সব প্রক্রিয়া বৈধ হবে। যেমন : একটি গরু একটি উটের ও একটি গরু পাঁচটি ছাগলের বিনিময়ে কিংবা দুই হালী কমলা দুই ডজন কলার বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় করা হলে, তাতে পরিমাণগত কমবেশি এবং বাকী নগদও বৈধ হবে।

আর দ্রব্য দুটির মাঝে বৈশিষ্টদ্বয়ের কোন একটি যদি বিদ্যমান থাকে আর অন্যটি না থাকে যেমন– ওজনের পদ্ধতি এক কিন্তু পণ্য এক জাতীয় নয় (যেমন : চাল ও ডাল) অথবা একই জাতীয় কিন্তু ওজনে দুটোই মাপা হয় না (যেমন বড় চিংড়ি, যা কেজি হিসেবে মেপে বিক্রি হয় এর বিনিময়ে ছোট চিংড়ির ভাগা বিক্রি হলে) তাহলে পরিমাণগত তারতম্যের সাথে বেচা-কেনা বৈধ হবে। কিন্তু নগদ হতে হবে; নগদ বাকীতে বৈধ হবে না।

এমনিভাবে যে সব দ্রব্য ওজন বা পাত্রে মেপে পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় না, বরং গণনা করে (যেমন- হালি, কুড়ি, শ) পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় (যেমন : শাকের মুঠা, লাকড়ীর আঁটি) এসব বস্তুর বেচাকেনার ক্ষেত্রে পণ্য ও মূল্য দুটো যদি এক প্রজাতির হয় (যেমন- এক হালী কমলার বিনিময়ে দু'হালী কলা) তবু পরিমানে কম-বেশি করা যাবে। তবে তা হতে হবে নগদ বেচা-কেনা, নগদ বাকী বৈধ হবে না। আর এক জাতীয় না হলে কমবেশি ও নগদ বাকী সব বৈধ।

সূদী পণ্যসামগ্রী

আমাদের সমাজে যে সব দ্রব্য সামগ্রী পণ্য হিসেবে প্রচলিত, তার পরিমাপ পদ্ধতি বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। যেমন:-

* ওজনের মাপ। দাঁড়িপাল্লা বা বাটখারা ইত্যাদি দিয়ে যা মাপা হয়। (যেমন- চাল, ডাল, লবণ, চিনি, আলু ইত্যাদি) কেজি, সের, মন, টন, লিটার এই মাপ পদ্ধতি মাপের অন্তরভুক্ত।

* পাত্রের মাপ। দ্রব্যের পরিমাণ নির্ধারণের এটিও একটি মাধ্যম। গ্রামেগঞ্জে ধান-চাল দাঁড়িপাল্লা দিয়ে যেমন মাপা হয়, তেমনি পরিমাণ নির্ধারণী বিশেষ পাত্র দ্বারাও মাপা হয়।

* গণনার মাধ্যমে মাপ। গণনার মাধ্যমেও (যেমন হালী, কুড়ি, শ) কোন কোন দ্রব্যের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। যেমন- কলা, কমলা, ডিম, লিচু ইত্যাদি।

* অনুমান ভিত্তিক মাপ। অনুমানের মাধ্যমেও কিছু পণ্য মাপা হয়। যেমন– শাক-সবজির মুঠা, লাকড়ির আঁটি, মাছের ভাগা-ইত্যাদি।

* মিটার ফুট বা গজের মাপ। গজ বা হাতের দৈর্ঘ দ্বারা কোন কোন পণ্যের পরিমাণ নির্ধারিত হয়। যেমন_ কাপড়, তার, চট, কার্পেট, জমি ইত্যাদি। ইঞ্চি, ফিট মিটার ইত্যাদি গজের মাপের শ্রেণীভুক্ত।

* কিছু কিছু দ্রব্য এমন আছে যাতে উল্লিখিত পরিমাপ পদ্ধতির কোনটিই প্রয়োগ হয় না কোন রূপ মাপ-জোক ছাড়া আস্ত দ্রব্য হিসেবেই তা বিক্রি করা হয়। যেমন– গরু, গাড়ি, ফ্রিজ, তরমুজ, কাঠাল, লুঙ্গী, চাদর, জগ, বালতি, বই, কলম, লাইট, টেবিল, ব্যাগ, ঘড়ি ইত্যাদি।

বর্ণিত পরিমাপ পদ্ধতিগুলোর মধ্যে প্রথম দুই প্রকার তথা ওজনের মাপ ও পাত্রের মাপে পরিমাণ নির্ণীত দ্রব্যাদি ছাড়া বাকী অন্য মাপের দ্রব্য বা যেগুলো মাপা ছাড়াই বিক্রি হয় সে সব পণ্যের ক্ষেত্রে বিধান হলো, যদি পণ্য ও মূল্য উভয় এক জাতীয় হয় (যেমন : কাঁঠালের বিনিময়ে কাঁঠাল, ডিমের বদলে ডিম, বইয়ের বিনিময়ে বই) তাহলে পরিমাণগত সমতা রক্ষা করা আবশ্যিক নয়, বরং কমবেশি বৈধ হবে। তবে নগদ বেচাকেনা হতে হবে। নগদ-বাকী হলে সূদ হবে। আর যদি এক জাতীয় না হয় বরং পণ্য হয় এক বস্তু এবং মূল্য অন্য বস্তু (যেমন- বালতী, জগ, গরু-ছাগল, লুঙ্গী, জায়নামাজের মধ্যে পারস্পরিক বিনিময়) তাহলে কম বেশি যেমন বৈধ হবে, তেমনি নগদ-বাকীও বৈধ হবে। কোন অবস্থাতেই সূদ হবে না। কারণ এ ক্ষেত্রে সূদের দু'টি মৌলিক বৈশিষ্টের একটিও নেই।

ওজনের মাপ ও পাত্রের মাপে ব্যবহৃত পণ্যাদি যেমনঃ ধান, গম, লবণ ইত্যাদির মধ্যে যদি লেনদেন হয়, তখন পণ্য ও মূল্য উভয়টি এক জাতীয় হলে, সেখানে উভয় দ্রব্যের পরিমাণ সমান হতে হবে এবং বেচা কেনা নগদ হত হবে। এ দুটির একটিও বিদ্যমান না থাকলে সূদী লেনদেনে পরিণত হবে। আর যদি পণ্য ও মূল্য এক জাতীয় দব্য না হয় তাহলে সেখানে কমবেশি করা বৈধ হবে বটে কিন্তু নগদ হওয়া আবশ্যক। নগদ বাকী হলে তা সূদে পরিণত হবে।

বাংলাদেশে ইসলামী জীবন বীমা ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা

কাজী মো: মোরতুজা আলী

'বীমা' শব্দটি আমাদের নিকট অতি পরিচিত। কিন্তু 'ইসলামী বীমা' সম্পর্কে আমাদের ধারণা খুব স্পষ্ট নয়। যদিও ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা সম্পর্কে ইতিমধ্যে আমাদের অনেকের বাস্তব ধারণা হয়েছে। অতএব ইসলামী বীমা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা নেয়া যেতে পারে। 'ইসলামী বীমা' প্রচলিত বীমা ব্যবসার সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় যদিও উভয়ের মধ্যে পদ্ধতিগত ও তত্ত্বগত যথেষ্ট মিল রয়েছে। বীমা ব্যবসা, পুঁজিবাদী অর্থনীতির একটি প্রধান ভিত। আধুনিক বীমা ব্যবস্থা আধুনিক জীবন যাত্রার এক অপরিহার্য অংশ হিসেবে গড়ে উঠেছে। শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্য, তথা অর্থনৈতিক অগ্রগতির সাথে সাথে বীমা ব্যবসার প্রসার স্বাভাবিক গতিতে হয়ে থাকে। জনপ্রতি গড় বীমা প্রিমিয়ামের অংক একটি দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং ঝুঁকি সচেতনতার পরিচায়ক।

জীবন ও সম্পদের যে সব ঝুঁকি আমরা প্রত্যক্ষ করি সে সব ঝুঁকি কিভাবে সব চাইতে উত্তম পদ্ধতিতে মোকাবেলা করা যায় সেই চিন্তা থেকে বীমা সেবার উৎপত্তি। জীবন মানেই ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা। বস্তুত অনিশ্চয়তা আমাদের নিত্যদিনের সাথী। আমরা চাই জীবনকে ঝুঁকি মুক্ত রাখতে। কিন্তু জীবনকে ঝুঁকি মুক্ত রাখা বাস্তবে সম্ভব নয়। স্বাভাবিকভাবে তাই আমরা ঝুঁকি মোকাবেলার পথকে বেছে নিয়েছি। ব্যবসায়ীদের জন্য ঝুঁকি এক রোমাঞ্চকর খেলার অংশ বিশেষ। ব্যবসা-বাণিজ্যে যেমন ঝুঁকি আছে, তেমনি আছে মুনাফার সম্ভাবনা। ব্যবসায় মুনাফার হারকে নিশ্চিত করার জন্য সব ধরনের নিখাদ ঝুঁকির (Pure Risk) বৈজ্ঞানিক ও নিয়মতান্ত্রিক মোকাবেলার প্রচলিত নাম হচ্ছে বীমা। ঠিক একইভাবে, মৃত্যু, স্বাস্থ্যহীনতা, বার্ধক্য, প্রভৃতির ফলে একটি পরিবারের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্যও বীমার ব্যবহার করা হয়।

অনেক ক্ষেত্রেই বীমা বাধ্যতামূলকভাবে করতে হয়। দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে একজন মোটর গাড়ি মালিককে বাধ্যতামূলকভাবে তৃতীয় পক্ষের দায় (third party liability) মেটাবার জন্য বীমাপত্র সংগ্রহ করতে হয়। ব্যবসায়ী মাত্রই জানেন যে আন্তর্জাতিক আমদানী রপ্তানীর ক্ষেত্রে পণ্যের বীমা গ্রহণের শর্ত ব্যতিরেকে ঋণপত্র

লেখক : ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড

খোলার জন্য ব্যাংক অনুমোদন দেয় না। এ ছাড়া ব্যাংক লীজ বা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে যে সব বিনিয়োগ করে সে সব প্রতিষ্ঠানের সম্পদ কিংবা তার নিজস্ব সম্পদ সমূহকে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রাখাকে যুক্তিযুক্ত মনে করে না।

বিনিয়োগকৃত সম্পদ যদি ঘটনাক্রমিক দুর্বিপাকের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বা বিনষ্ট হয় তবে ব্যাংক আমানতকারীদের অর্থের হেফাযত করতে ব্যর্থ হবে। অতএব বিভিন্ন ধরনের বীমার মাধ্যমে ঝুঁকিমুক্তভাবে সম্পদের সংরক্ষণ ব্যাংকের নৈতিক, সামাজিক ও আইনগত দায়িত্ব। যেহেতু প্রচলিত বীমা ব্যবসা ইসলাম সম্মত নয় সেহেতু ইসলামী ব্যাংক বা ধর্মপ্রাণ মানুষের নিকট তা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। অতএব শরীয়ত অনুমোদিত পন্থায় বীমা ব্যবস্থার প্রবর্তন ও পরিচালনা সময়ের এক জরুরী দাবি।

ইসলামী জীবন বীমা কেন ?

সুষম আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার আমাদের শাসনতন্ত্রের মৌল নীতিমালার অন্তরভুক্ত। অতএব সামাজিক সুবিচার ভিত্তিক কল্যাণ রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে আমাদের ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধের আলোকে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ইসলামী মূল্যবোধ ও নীতিমালা ভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা হলে তা শুধুমাত্র শাসনতান্ত্রিক অঙ্গীকার পূরণেরই সহায়ক হবে না। বরং তা হবে আদর্শভিত্তিক জীবন যাপনের মহত উদ্যোগ।

আমরা জানি বর্তমান বিশ্বের সর্বত্র ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসাবে পেশ করা হচ্ছে এবং অর্থনীতি ও ব্যবসা বাণিজ্যের যাবতীয় অংগনে ইসলামের বিজ্ঞান ভিত্তিক নীতিমালা প্রয়োগের ব্যাপারে যথেষ্ট অনুকূল সাড়া পরিলক্ষিত হচ্ছে। বর্তমানে মুসলিম অমুসলিম রাষ্ট্র নির্বিশেষে গড়ে উঠছে ইসলামী শরীয়া ভিত্তিক ব্যাংক, বীমা ও বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান। অত্যন্ত আশা ও গর্বের ব্যাপার এই যে পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশে ইতোমধ্যে ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক সূদবিহীন ব্যাংক ও বীমা ব্যবস্থা চালু হয়েছে। জনগণ এই প্রচেষ্টাকে শুধু সমর্থনই করেনি বরং সক্রিয় সহযোগিতা দান করেছে।

আমরা জানি সূদবিহীন ব্যাংক ব্যবস্থা চালু হবার পর থেকে এদেশের ধর্মপ্রাণ উদ্যোক্তাগণ ইসলামী শরীয়া মোতাবেক বীমা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অধিকতর উপলব্ধি করেছেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে সুদান, তিউনিসিয়া, সৌদী আরব, ইরান, বাহরাইন, মালয়েশিয়া, ব্রুনাই, ইন্দোনেশিয়া, সিংগাপুর, শ্রীলংকা প্রভৃতি রাষ্ট্রে শরীয়া ভিত্তিক বীমা প্রতিষ্ঠান দক্ষতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

এ ছাড়া যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, সুইজারল্যান্ড, লুক্সেমবার্গ এবং বাহামায় ইসলামী বীমা (তাকাফুল) প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে এবং সফলতার দৃষ্টান্ত স্থাপনে সক্ষম হয়েছে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ সচেতন ও ধর্মপ্রাণ বাংলাদেশের চিন্তাবিদগণ জনগণের চাহিদা মোতাবেক ইসলামী বীমা ব্যবস্থা প্রচলনের তাগিদ অনুভব করেছেন

এবং সুখের বিষয় এই যে বিনিয়োগকারী উদ্যোক্তাগণও এ ব্যাপারে সংগঠিত হয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন এবং বাংলাদেশে একাধিক (তিনটি) ইসলামী বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

বীমা নিয়ে বিতর্ক

ইসলামের দৃষ্টিতে বীমার বৈধতা নিয়ে বিতর্ক দীর্ঘ দিনের। এর মধ্যে জীবন বীমা নিয়ে বিতর্কের মাত্রা অনেক বেশি। বিতর্কের মৌল বিষয়গুলো নিয়ে কিছুটা আলোকপাত করা যেতে পারে।

ক) জীবন বীমা কি জীবনের বীমা করে? না, বস্তুত তা নয়। জীবন বীমা একটি আর্থিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা। বীমাযোগ্য স্বার্থ ব্যতিরেকে বীমা করা যায় না। মানুষের জন্য ঝুঁকি যেমন অবধারিত তেমনি মৃত্যুও অবধারিত। অনাকাঙ্খিত দুর্ঘটনা আমরা এড়াতে পারি না। দুর্ঘটনার ফলে আমাদের জীবনে নেমে আসে দুঃখ, দুর্দশা ও দৈন্য। জীবন বীমার দ্বারা জীবনের আর্থিক দৈন্য ও আর্থিক ক্ষতির মোকাবেলা করা হয়। কারো করুণা বা দয়ার ভিক্ষা দ্বারা নয়, এটি করা হয় পরস্পরের সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে। নিজেদের পরিবার পরিজনকে কারো মুখোপেক্ষি না করে প্রয়োজনীয় বিত্তের ব্যবস্থা করা ইসলামেরই শিক্ষা।

খ. জীবন বীমা কি সূদ ও জুয়ার সমতুল্য নয়? না, প্রচলিত বীমা সূদ ভিত্তিক হলেও তা জুয়ার সমতুল্য নয়। বস্তুত : জুয়া যেখানে ঝুঁকি সৃষ্টি করে, বীমা সেখানে ঝুঁকি মোকাবেলায় সহায়তা করে। বীমা পদ্ধতি জুয়া বা লটারির অনুরূপ নয় বরং এর বিপরীত। জুয়া বা লটারী যেখানে ঝুঁকি সৃষ্টি করে, বীমা সেখানে চলমান ঝুঁকি জনিত ক্ষতি নিরসনে সহায়তা প্রদান করে। ক্ষতি নিরসনে মানুষ যদি পরস্পরের প্রতি সহমর্মিতার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস গ্রহণ করে তখন তা পাপ নয় পূণ্য হিসাবে গণ্য হবার কথা। বীমাকারী ও বীমা গ্রহীতার অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সূদমুক্ত, জুয়ামুক্ত চুক্তির দ্বারা জীবন বীমা ব্যবসা পরিচালিত হলে তা ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ বলে গণ্য হতে পারে।

গ. জীবন বীমা কি ইসলামের মৌল বিশ্বাসের পরিপন্থী নয়? অবশ্যই তা নয়। নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাসের পরিপন্থী বা বিকল্প হিসাবে মুসলমানরা জীবন বীমা ক্রয় করেন না। বরং সৃষ্টিকর্তার প্রতি অবিচল আস্থা ও নির্ভরশীলতা বজায় রেখেই বীমা পদ্ধতির (পারস্পরিক সহযোগিতা) মাধ্যমে নিজের, নিজ পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতা আনয়নের উদ্যোগ ইসলামের মৌল বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। ভালো কাজে পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য পবিত্র কুরআনে তাগিদ দেয়া হয়েছে। (সূরা আল-মায়েদা : ২)

ইসলামী বীমা কি ?

ইসলামী বীমা কি ? এ সম্পর্কে একটি পরিচ্ছন্ন ধারণা থাকা প্রয়োজন। ইসলাম 'ফিতরত' বা প্রকৃতির ধর্ম। অতএব মানব প্রকৃতির প্রতিটি প্রয়োজনকে ইসলাম স্বীকার করে এবং গুরুত্ব দেয়। কিন্তু প্রতি ক্ষেত্রেই ইসলাম কিছু সীমারেখা টেনে দেয়। মানব জীবনের জন্য ক্ষতিকর বিষয় যেমন জুয়া, মদ, ফটকাবাজারী ইত্যাদি ইসলাম অনুমোদন করে না। স্বাভাবিকভাবেই ইসলামী ব্যবস্থার অধীন এমন কোনো অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান চালু করা সম্ভব নয় যেখানে জুয়া, সূদ, বা ফটকাবাজারীর অবকাশ আছে। ফলে ইসলামী চিন্তাবিদগণ এ ব্যাপারে একমত যে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় বীমা ব্যবসা যে পদ্ধতিতে পরিচালনা করা হয়ে থাকে তা ইসলাম সম্মত নয়। কারণ প্রথমত পুঁজিবাদী ব্যাংক ব্যবস্থার মত পুঁজিবাদী বীমা ব্যবস্থাও গড়ে উঠেছে পুঁজিপতির পুঁজি সৃষ্টির মাধ্যম বা হাতিয়ার হিসাবে। ইসলামী সমাজ ঠিক এর বিপরীতে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তুলতে চায় যা সমাজের সাধারণ মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত। অপরের পুঁজিকে ভিত্তি করে একটি বিশেষ গোষ্ঠী লাগামহীন মুনাফা ভোগ করবে ইসলাম তা অনুমোদন করে না।

অতএব বর্তমানে যে পদ্ধতিতে বীমা ব্যবসা পরিচালনা করা হয় তার পরিবর্তে 'সকলের তরে সকলে আমরা' নীতির উপর ভিত্তি করে বীমা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভব। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের কার্য পদ্ধতি অনেকটা সমবায় প্রতিষ্ঠানের অনুরূপ হবে। কিন্তু বাস্তবে সংগঠনটি অবয়ব ও গঠন প্রকৃতিতে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসাবে গড়ে উঠবে। দেশের কোম্পানী আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠানটি রেজিস্ট্রি করা প্রয়োজন হবে এবং কোম্পানীর উদ্যোক্তা বিনিয়োগকারীগণ জনগণের মাঝে খোলা বাজারে শেয়ার ছাড়তে পারবে। তবে অন্যান্য জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর তুলনায় এই প্রতিষ্ঠানের বিশেষত্ব হবে এই যে বোর্ডে কোম্পানীর শেয়ারমালিকদের প্রতিনিধিদের পাশাপাশি পলিসি গ্রাহকদের মধ্য থেকেও পরিচালনা বোর্ডে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি বোর্ড সভায় নির্বাচিত হতে পারবেন।

এ ছাড়া শেয়ার মালিকদের মূলধন এবং পলিসি গ্রাহকদের উদ্বৃত্ত তহবিল বিনিয়োগ করা হবে সম্পূর্ণ আলাদা হিসাবের মাধ্যমে। অর্থাৎ শেয়ার মালিকদের বিনিয়োগ থেকে যে মুনাফা আসবে তা কোম্পানীর পলিসি গ্রাহকদের উদ্বৃত্ত তহবিল বা এর মুনাফার সাথে একীভূত করা হবে না। পলিসি গ্রাহকদের জমাকৃত চাঁদা বা প্রিমিয়ামের অংক পৃথক দু'টি অংশে বিভক্ত করা হবে। শুধুমাত্র শরীয়ত অনুমোদিত খাতসমূহে এবং পদ্ধতির মাধ্যমে কোম্পানীর মূলধন ও তহবিল বিনিয়োগ করা হবে। একটি 'শরীয়া তত্ত্বাবধায়ক কমিটি' কোম্পানীর সকল কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবে এবং শরীয়তের অনুমোদন/অননুমোদন বিষয়ে মতামত প্রদান করবে।

ইসলামী পদ্ধতিতে জীবন বীমা গ্রহীতাগণকে একটি সমিতির সদস্যের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। যেখানে সদস্যগণ একটি সাধারণ তহবিলে চাঁদা প্রদান করবে। এই চাঁদার অর্থ শরীয়ত অনুমোদিত পথে (সূদমুক্তভাবে) বিনিয়োগ করা হবে। ইসলাম প্রবর্তিত

বীমা ব্যবস্থা মূলত একটি সহযোগিতামূলক প্রতিষ্ঠান যেখানে পারস্পরিক কল্যাণ সাধনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার ঝুঁকি থেকে ব্যক্তি ও সমাজ উপকৃত হয়ে থাকে।

বীমা ব্যবসা ও ইসলাম

বীমা ব্যবসা ইসলাম সম্মত কি না এ বিষয়ে গত শতাব্দীতে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। ইসলামী চিন্তাবিদগণ ফিকহ ও শরীয়তের আলোকে বিষয়টি পর্যালোচনা করার পর দেখেছেন যে পারস্পরিক সহযোগিতার নীতি অনুযায়ী সূদমুক্তভাবে বীমা ব্যবসা পরিচালনা করা হলে তা ইসলাম বিরোধী হবে না।

ইসলামী ব্যবস্থায় বীমা ব্যবসা যে পদ্ধতিতে কাজ করবে তা ইতোপূর্বে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ইসলামী জীবন বীমা প্রচলনের ক্ষেত্রে যদি কোনো শরীয়ত বিরোধী ব্যবস্থা বা পদ্ধতির ছোঁয়া না পাওয়া যায় তবে তাকে ইসলাম সম্মত নয় বলার কোনো যুক্তি নেই। এ ছাড়াও ইসলামী বীমা ব্যবস্থার গ্রহণযোগ্যতা বিচার করতে হবে এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দ্বারা।

ইসলামী বীমা পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা দীর্ঘদিন থেকে আলোচনা করে আসছি। এ আলোচনার ফলশ্রুতিতে আমরা যা বুঝেছি তা নিম্নরূপ :

ক. আমরা লক্ষ্য করেছি, বীমা ও জুয়া সম্পূর্ণ আলাদা ও বিপরীতধর্মী এবং ইসলাম ধারণাযোগ্য ঝুঁকি মোকাবেলার নীতি অনুমোদন করে।

খ. আমরা বুঝতে পেরেছি যে, বর্তমান যুগে বীমার অনেকগুলো অত্যাবশ্যক সামাজিক ও অর্থনৈতিক উপযোগিতা রয়েছে।

গ. আমরা জানি, পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে অনুসৃত বীমা পদ্ধতির বিভিন্ন ত্রুটি রয়েছে এবং এ পদ্ধতি ইসলামী শরীয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

ঘ. আমরা অনুভব করি যে, ইসলামী শরীয়ার আওতাধীনে একটি নতুন বীমা পদ্ধতি চালু করা যায় যার ভিত্তি হবে আত্-তাকাফুল বা যৌথ নিশ্চয়তা এবং পারস্পরিক সহযোগিতা।

ঙ. বীমার নতুন পদ্ধতি (তাকাফুল) অনুসরণ করলে তা বীমা গ্রহীতা, বীমাকারী এবং সাধারণভাবে সমাজের জন্য অধিকতর সুফল বয়ে আনবে।

সমস্যা সমূহ (সাধারণ সমস্যা)

ইসলামী বীমার সাধারণ সমস্যা সম্পর্কে আলোকপাত করতে হলে প্রথমে আমাদের শিক্ষিত সমাজের একাংশের দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন। ইসলামী কোন প্রতিষ্ঠান এই সমাজে প্রতিষ্ঠিত হোক সমাজের এক শ্রেণীর লোক তা কামনা করেন না, বরং অনেকেই এর বিরোধিতা করেন। ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তির ঘন

কুয়াশা আমাদের এমনভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে যে এ সম্পর্কে কোন আলোচনাও অনেকে অপছন্দ করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নেহায়েত অজ্ঞতা থেকে তাদের মনে সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের প্রধান সমস্যা এই যে, সমাজের উঁচু শ্রেণীর মধ্যে এ ধরনের অজ্ঞতা ও সংশয় অধিক পরিমাণে বিরাজ করছে। এই দু:খজনক বাস্তবতা কিন্তু হঠাৎ বিনামেঘে বজ্রপাতের মত সৃষ্টি হয় নি। বরং শতাব্দীর পুঞ্জিভূত ক্রম অবক্ষয়ের চরম পরিণতি এ অবস্থার জন্য দায়ী।

বিগত কয়েক শতাব্দীতে মুসলমানদের মধ্যে জ্ঞান, শিক্ষা, গবেষণা, চিন্তা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে বন্ধ্যাত্যের সৃষ্টি হয়েছিল তার চরম পরিণতি ও অশুভ প্রভাবের ফলেই শিক্ষিত শ্রেণীর মুসলমানরা পাশ্চাত্য চিন্তা-চেতনার রঙীন চশমা ব্যতিরেকে কোনো কিছু দেখতে পান না। পাশ্চাত্যের নয়, এমন কোন কিছু তাদের অনুপ্রাণিত করতে পারে না বা বিশ্বাসযোগ্যতা সৃষ্টি করে না। আপাত বিরোধী মনে হলেও এ কথা সত্য যে, পাশ্চাত্যের সভ্যতা-সংস্কৃতির লালন ও অন্ধ অনুকরণ আমাদের সমাজে এক ধরনের নেশা বা ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে।

আমাদের মধ্যে যারা পাশ্চাত্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত নিজেদের ধর্মের জ্ঞান এদের অতি সীমিত। স্বাভাবিকভাবে ইসলামী নীতিমালা অনুসারে কোনো প্রতিষ্ঠান চালু করার জন্য শরীয়তের বিধি বিধানের বিষয় উত্থাপিত হলে এসব প্রস্তাবের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করা তাদের জন্য কষ্টকর হয়। ফলে যে কোন প্রস্তাব পাশ কাটিয়ে চলা বা ধামাচাপা দিয়ে রাখা এদের পক্ষে স্বাভাবিক। ইসলামী বীমা চালুর ক্ষেত্রে আমাদের সামনে যে সব বাধার প্রাচীর রয়েছে তা কিন্তু অলংঘনীয় নয়। এখানে মৌলিক যে সমস্যা তা হচ্ছে অনেকে এটা বিশ্বাস করেন না যে ইসলামী নীতিমালার আলোকে বীমা ব্যবস্থার প্রচলন হলে সমাজ কল্যাণের ইপ্সিত লক্ষ্যসমূহ অর্জন সম্ভব। এটি অবশ্যই ইসলামের কোন ত্রুটি নয়। ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের চরম অজ্ঞতা থেকে এই অবিশ্বাসের জন্ম হয়েছে। অতএব আমাদের প্রথম ও প্রধান কাজ হবে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর নিকট ইসলামী বীমার নীতিমালা ও বিশেষত্বসমূহ ব্যাখ্যা করা। শরীয়া আইনের গতিশীলতা এবং কিভাবে তা প্রতিযুগের প্রগতিকামী মানব সমাজের চাহিদা মেটাতে সক্ষম সে সম্পর্কে সমাজে স্বচ্ছ ধারণা সৃষ্টি করতে হবে। আমরা যদি তা করতে পারি তাহলেই ভ্রান্তির কুয়াশা দূরীভূত হবে এবং সমাজের বুদ্ধিজীবিগণ ইসলামী বীমার স্কীম সমূহে সমর্থন দেবেন।

ইসলামী বীমার প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় যে প্রধান বাধা তা হচ্ছে অনেকেই ইসলামী শরীয়ার বিধি বিধান একালে অচল বলে মনে করেন। তারা মনে করেন অতীতে যে সব আইন কানুন বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বা প্রয়োজনে প্রণয়ন করা হয়েছিল সেগুলো পুনঃপ্রবর্তন করা নির্বুদ্ধিতারই নামান্তর।

কিন্তু শরীয়তের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানব জীবনকে সভ্য, সুন্দর ও পবিত্র রূপে গড়ে তোলা, এবং মানব জীবনকে সকল প্রকার অন্যায়, অবিচার ও পাপ-পংকিলতা মুক্ত করা।

শরীয়তের মূল লক্ষ্য যদি আমরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হই তবে শরীয়তে জীবনের লক্ষ্য এবং ইসলামী বীমার তাৎপর্য উপলব্ধি করা আমাদের জন্য সহজসাধ্য হবে। শরীয়তের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানব জীবনকে সৎ, সুন্দর, ন্যায় ও পবিত্রতার ভিত্তিতে গড়ে তোলা। শরীয়তের পরিভাষায় একে বলা হয়েছে 'মারুফাত' বা 'ভালো কাজ'। এর বিপরীতে যা কিছু অন্যায়, অসুন্দর, পাপ-পংকিলতায় পরিপূর্ণ তাকে বলা হয়েছে 'মুনকারাত' বা মন্দ কাজ। মুসলমানদের জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশ হচ্ছে ভালো কাজে সহযোগিতা ও মন্দ কাজের বিরোধিতা করার।

এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, পাপ পূণ্যের কোনো তালিকা প্রণয়নের মাধ্যমে শরীয়তের বিধি বিধানকে সীমিত করে রাখা হয়নি। শরীয়ত মানব জীবনের জন্য একটি পরিপূর্ণ ছক বা নকশা পরিবেশন করেছে যার ফলে মানবীয় সৎ গুণাবলী বিকশিত হতে পারে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য শরীয়তে সেই সব কাজ ও পদ্ধতিকে উৎসাহিত ও অনুমোদিত করা হয় যা সৎ ও সুন্দরকে বিকশিত করতে পারে।

শরীয়তের দৃষ্টিতে মারুফাত বা ভালো কাজ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত যথা- (ক) নির্দেশকারক (ফরয/ওয়াজিব) (খ) উপদেশমূলক (মতলুব) (গ) অনুমোদিত (মুবাহ)। শরীয়তে স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করা হয়নি এমন সব কাজকেই মুবাহ বলা হয়। অনুমোদনযোগ্য মারুফাতের (মুবাহর) পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। সুস্পষ্ট ও নিষেধাজ্ঞার বাইরে 'মুবাহ' কোনটি তা যুগে যুগে সময়ের দাবি অনুযায়ী নির্ধারণ করার দায়িত্ব ধর্মীয় বিশেষজ্ঞগণের।

আমাদের তৃতীয় যে সাধারণ সমস্যা তা হচ্ছে এই যে, সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে শরীয়তের আইন প্রণয়ণ ও প্রয়োগের জন্য ইজমা, কিয়াস, ইজতিহাদ, ইসতিহসান প্রভৃতির প্রতি আমাদের অনীহা। অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা, অনুসিদ্ধান্ত, রায় ও বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে অজ্ঞতা ও অনগ্রসরতা ইসলামী প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতির পথে একটি প্রধান অন্তরায়। অগাধ পান্ডিত্য এবং জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিবর্গের প্রতি সময়ের ও সমাজের দাবি এই যে, তারা যেন নিজেদের মেধা, প্রজ্ঞা ও ব্যুৎপত্তির সাহায্যে শরীয়ার আলোকে প্রচলিত বীমা ব্যবস্থা ও পদ্ধতির প্রয়োজনীয় সংস্কার ও প্রয়োগে সহযোগিতা দান করেন।

এখানে যে বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে এই যে, লক্ষ্য অর্জনের জন্য যথেষ্ট শ্রম ও সময়ের প্রয়োজন। কেন না প্রচলিত বীমা ব্যবস্থার নীতি, পদ্ধতি, সমস্যাসমূহকে প্রথমে চিহ্নিত ও বিন্যস্ত করতে হবে। এরপর এসব বিষয়ে ইসলামের বক্তব্য কি তা উদঘাটন করতে হবে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে ইসলামের বক্তব্য বিষয়গুলো আধুনিক গবেষকদের ব্যবহারের উপযোগী অবস্থায় নেই। কারণ এগুলো আধুনিক জ্ঞানের অনুরূপ বিন্যস্ত নয়। ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত পণ্ডিতগণ প্রায়শ এগুলোর মর্ম অনুধাবনে ব্যর্থ হন। ইসলামী জ্ঞানের বিপুল ভান্ডার অনুসন্ধানের উদ্যম ও সময় এসব জ্ঞানী ব্যক্তিদের নেই।

অন্যদিকে প্রাচীন পদ্ধতিতে শিক্ষিত আলেমগণ আধুনিক বীমা ব্যবস্থার বিস্তারিত বিষয়াদি সম্পর্কে অজ্ঞতার দরুন এগুলোর সাথে ইসলামী বিধানের সম্পর্ক নির্ণয়েও ব্যর্থ হন। অতএব বীমা ব্যবস্থার বিস্তারিত দিক সমূহের উপর যথেষ্ট আলোচনা ও পর্যবেক্ষণ হওয়া প্রয়োজন। যাতে করে আমাদের আলেমগণ প্রস্তাবিত পদ্ধতি সমূহের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট মতামত ও রায় প্রদান করতে পারেন। ঠিক একইভাবে আধুনিক বীমা ব্যবস্থা সম্পর্কে ওয়াকেবহাল ও বিশেষজ্ঞদেরকে ইসলামী শরীয়া ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইসলামের পণ্ডিতগণ কিভাবে অনুধাবন করেছেন, সমাধানের পথ বাতলে দিয়েছেন তা জানতে হবে এবং উপলব্ধি করতে হবে। এর ফলে সম্ভব হবে পাশ্চাত্যের বীমা পদ্ধতি সম্পর্কে প্রকৃত ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ও সকল প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাওয়া।

চতুর্থ সাধারণ সমস্যা হচ্ছে এই যে, একালে শরীয়তের সকল বিধি পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না। শরীয়তের কিছু অংশ গ্রহণ এবং কিছু অংশ বর্জন সম্ভব নয়। সম্পূর্ণ শরীয়তকে সামষ্টিকভাবে পালন না করা হলে সমাজে পূর্ণাঙ্গ কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। যেমন সূদমুক্ত ব্যাংক ব্যবস্থা কখনই পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না যদি না পাশাপাশি সূদমুক্ত শরীয়ত ভিত্তিক বীমা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। সূদ মুক্ত বিনিয়োগ ব্যবস্থার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকলে ইসলামী ব্যাংক বা ইসলামী বীমার জন্য তা সুফল বয়ে আনবে না। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়তের বিধি বিধান চালু না হলে ইসলামী ব্যাংক, বীমা, বিনিয়োগ সবকিছুই হোঁচট খেতে থাকবে।

শরীয়তের প্রতিটি হুকুমকে কাজে পরিণত করা ও তার প্রতিটি অংশের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা মুসলমানদের জন্য একান্ত কর্তব্য। এরূপ করা হলে কুরআনের নির্দেশ পরিপূর্ণভাবে মানা হয়। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে 'তোমরা কি কুরআনের কতক অংশ বিশ্বাস কর আর কতক অংশ অবিশ্বাস কর ? তাই যদি হয়, তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করবে তাদের শাস্তি হলো দুনিয়ার জীবনে চরম লাঞ্ছনা এবং কেয়ামতের দিনে তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে কঠিন আযাবের মধ্যে'।

'ইসলামী বীমা' ব্যবস্থা পরিপূর্ণভাবে শরীয়তের বিধি মোতাবেক পরিচালিত করা ছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই। প্রচলিত বীমার সবকিছু হুবহু রেখে দিয়ে শুধু মাত্র ভাষাগত কিছু পরিবর্তন, পরিবর্ধন করলেই তা 'ইসলামী বীমা' হিসেবে পরিগণিত হবে না। শরীয়া আইন মোতাবেক কিছু কিছু পরিবর্তন করা হল আর কিছু কিছু পরিবর্তন করা হল না তা শরীয়ার দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হবে না। বরং এরূপ করলে আমাদের জন্য চরম লাঞ্ছনা ও পরকালীন কঠিন শাস্তির বিষয়ে পবিত্র কুরআনে সাবধান করে দেয়া হয়েছে।

সাময়িক সমস্যা

ইসলামী বীমা ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের পথে কতিপয় সাময়িক সমস্যার প্রতি আমরা এবারে দৃষ্টিপাত করব। বাংলাদেশে ইতোমধ্যে তিনটি ইসলামী বীমা কোম্পানী এবং একাধিক প্রচলিত জীবন বীমা (Conventional Life Insurance) 'ইসলামী বীমা

প্রকল্প' নামে কাজ করলেও বীমা নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এসব প্রতিষ্ঠানের বিশেষত্ব ও কার্যপদ্ধতির ব্যাপারে বিশেষ বিধি বা আইন প্রণয়নের উদ্যোগ এখনও নেয়া হয় নি। যেহেতু ১৯৩৮ সালের বীমা আইনের অধীনে ইসলামী বীমা কোম্পানী সমূহের রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে, সেহেতু আপাত দৃষ্টিতে একথা বলা যায় যে ইসলামী বীমা কোম্পানীসমূহের ক্ষেত্রেও ১৯৩৮ সালের বীমা আইন প্রযোজ্য।

কিন্তু ইসলামী জীবন বীমা কোম্পানীর সংঘ স্মারকে (Memorandum) স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে যে, শরীয়া আইন অনুযায়ী কোম্পানীর সকল কার্যক্রম পরিচালিত হবে। এ ক্ষেত্রে বাস্তবতার দাবি হচ্ছে, ইসলামী বিধি মোতাবেক যারা বীমা ব্যবস্থা পরিচালিত করতে চান তাদেরকে আইনগতভাবে তা করার জন্য বিধিগত সমর্থন প্রদান করা। অন্যথায় সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তির নিরসন করা দুরূহ হবে।

প্রচলিত বীমা আইনের কতিপয় ধারার প্রয়োগ ইসলামী বীমার জন্য রহিত করা যেতে পারে, কিংবা ইসলামী বীমার জন্য নতুন বীমা আইন প্রণয়ন ও প্রচলন করা যেতে পারে। পৃথিবীর অনেক দেশে এর উদাহরণ রয়েছে। এ জন্য বীমা অধিদপ্তরে ইসলামী বীমার জন্য 'বিশেষ সেল' গঠন করা যেতে পারে। প্রস্তাবিত সেল বা শাখা শরীয়া ভিত্তিক বীমা ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের জন্য আইনগত ও বিধিগত জটিলতা সমূহ চিহ্নিত করে তা দূরীভূত করার উদ্যোগ নিতে পারে।

ইসলামী জীবন বীমার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সাময়িক সমস্যা হচ্ছে, প্রচলিত 'জীবন বীমার' প্রিমিয়াম হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে সূদ ভিত্তিক বিনিয়োগ আয়কে হিসাবের মধ্যে ধরা হয়। যেহেতু ইসলামী জীবন বীমার বিনিয়োগ সূদমুক্ত ব্যবস্থায় করতে হবে সেহেতু প্রতিটি 'প্রডাক্ট' এর প্রিমিয়াম হার নির্ধারণের জন্য সূদ এর পরিবর্তে সম্ভাব্য মুনাফাকে ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা প্রয়োজন। সম্ভাব্য মুনাফার ভিত্তিতেও প্রিমিয়াম নির্ধারণ সম্ভব বিধায় এ সমস্যা হতে উত্তরণ সহজসাধ্য হবে।

ইসলামী 'জীবন বীমা'র ক্ষেত্রে আর একটি প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ সাময়িক সমস্যা হচ্ছে সর্বস্তরের মানুষের কাছে ইসলামী জীবন বীমার ধারণাগত ও পদ্ধতিগত (Conceptual and Procedural) রূপরেখা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার অভাব। ইসলামী জীবন বীমার উপর পুস্তক-পুস্তিকা, প্রবন্ধ ও গবেষণাধর্মী লেখার অভাবের ফলেই এ সমস্যার উদ্ভব। জীবন বীমার ইসলামী বাস্তবায়নের ইতিহাস দুই দশকেরও কম। মুসলিম দেশসমূহে ব্যাপকভাবে ইসলামী জীবন বীমার উপর পর্যাপ্ত আলোচনা, গবেষণা না হওয়ার ফলে যারা জীবন বীমার ইসলামী রূপায়ন দিতে এগিয়ে এসেছেন তাদের মধ্যেও এ ব্যাপারে পরিপূর্ণ ও স্বচ্ছ ধারণার অভাব রয়েছে। এর ফলে দৈনন্দিন কাজ কর্ম পরিচালনায় যারা নিয়োজিত হবেন তারা যদি প্রথম থেকেই সম্ভাব্য সকল সূত্র থেকে বীমা সম্পর্কে তথ্য, উপাত্ত, সাহিত্য, জ্ঞান, গবেষণার উপাদানসমূহ নিজেদের আয়ত্তে আনতে সচেষ্ট হন এবং প্রাপ্ত জ্ঞানের ভিত্তিতে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সঠিক সমাধানের পথসমূহ চিহ্নিত করতে সক্ষম হন তাহলে এ সমস্যার আশু সমাধান সম্ভব।

ইসলামী জীবন বীমা বাস্তবায়নের চতুর্থ সাময়িক সমস্যা হচ্ছে উপযুক্ত ও প্রশিক্ষিত জনবলের অভাব। দেশের বীমা পেশাজীবীদের মধ্যে ইসলামী বীমা সম্পর্কে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা উভয়টির অভাব রয়েছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এটি স্বাভাবিক। ফলে প্রচলিত বীমার কর্মী বাহিনী ও নতুন অনভিজ্ঞ নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মীদেরকে পরিকল্পিতভাবে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির মাধ্যমে প্রশিক্ষিত করা প্রয়োজন। প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ইসলামী জীবন বীমার উৎস, ইতিহাস, বৈশিষ্ট, প্রচলিত বীমার সঙ্গে এর তফাৎ ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি ছাড়াও নীতি, নৈতিকতা, সততা ও নিস্বার্থ সেবার মনোভাব সৃষ্টি করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন। উপযুক্ত প্রশিক্ষণের পাশাপাশি পেশাগত শিক্ষার বিষয়টিকে সম গুরুত্ব দিতে হবে। কর্মীবাহিনীর আদর্শবাদিতা ও পেশাগত উৎকর্ষতার সমন্বিত রূপায়নের উপর নির্ভর করছে ইসলামী জীবন বীমার সফলতার গতি। এক্ষেত্রে অনীহা বা অবহেলা আত্মঘাতী হবে বিধায় বিষয়টি অতীব গুরুত্বের সাথে বিবেচনার মধ্যে রাখতে হবে।

চলতি সমস্যা (Current Problems)

আমাদের দেশের বীমা বাজারে ও প্রচলিত জীবন বীমায় যে সব মৌলিক সমস্যা বিরাজমান, ইসলামী বীমার ক্ষেত্রেও তা সমভাবে বর্তাবে। আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ 'বীমা' বলতে জীবন বীমাকেই বুঝে থাকে। সাধারণ বীমা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা অত্যন্ত সীমিত বা নেই বললেই চলে। কিন্তু জীবন বীমা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা ইতিবাচক নয় বরং নেতিবাচক বলা চলে। বীমা সম্পর্কে মানুষের ধারণা নেতিবাচক হওয়ার পেছনে অনেক কারণ রয়েছে। আজকের আলোচনায় সেদিকে দৃষ্টিপাত না করে আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি জীবন বীমা সম্পর্কে মানুষের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন প্রয়োজন। কেন না জীবন বীমা ব্যবস্থা অবশ্যই জন কল্যাণমুখী ধ্যান ধারণা হতে উৎসারিত। মানুষের কল্যাণ বা মঙ্গল যেখানে নিহিত সেখানে মানুষ যদি এর সুফল সম্পর্কে সন্দিহান হয় তবে বুঝতে হবে সমস্যাটির জন্য বীমা ব্যবস্থা নয় বরং এর সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গই দায়ী।

ইসলামী বীমার প্রস্তাব মানুষের নিকট যখন পেশ করা হবে তখন এদেশের সর্বস্তরের জনগোষ্ঠীর মধ্যে তাৎক্ষণিক ব্যাপক ইতিবাচক সাড়া পড়ে যাবে এমন নয়। জীবন বীমা সম্পর্কে মানুষের অনীহার মধ্যেই ইসলামী বীমা কর্মীদের কাজ করতে হবে এবং মানুষের মধ্যে বীমা ব্যবস্থার প্রতি আস্থার ভাব ফিরিয়ে আনতে হবে। একাজটি করা সহজ হবে যদি গ্রাম-গঞ্জে, নগরে-বন্দরে যে সমস্ত বীমা কর্মী মানুষের নিকট ইসলামী জীবন বীমার সওগাত বয়ে নিয়ে যাবেন তাদেরকে উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও নৈতিকমানে উন্নীত করা হয়। বীমা প্রতিনিধিরা এজেন্টদের আচার, আচরণ, চারিত্রিক মাধুর্য্য, সেবা, সততা, সত্যবাদিতা ইত্যাদি গুণাবলীর উপর ইসলামী জীবন বীমার সফলতা অধিকাংশ নির্ভরশীল।

প্রচলিত জীবন বীমার দ্বিতীয় সমস্যা হচ্ছে এই যে সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে এই বীমা ব্যবস্থায় মানুষের পরিবর্তিত প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী বিস্তার ও বিভিন্ন মুখী

বীমাপত্র চালু করা হয়নি। প্রতিবেশি দেশ ভারতসহ পৃথিবীর অনেক দেশে প্রায় শতাধিক জীবন বীমার প্রডাক্ট বা বীমা পলিসি চালু রয়েছে। একথা সত্য যে সব পলিসির সমান চাহিদা নেই। কিন্তু সব ধরনের চাহিদা মেটানোর জন্য বীমা কোম্পানীসমূহকে অবশ্যই নানামুখী বীমা পলিসি তৈরি করতে হবে। এটি করা সম্ভব হলে সর্বস্তরের সকল মানুষের চাহিদা মেটানোর মাধ্যমে বীমার বাজার ক্রম সম্প্রসারিত হতে থাকবে। এ জন্য প্রয়োজন সার্বক্ষণিক বাজার গবেষণা (Continuous market research) সম্প্রতি জীবন বীমার ক্ষেত্রে পল্লীর জন সাধারণ, নিম্ন বিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে কতিপয় নতুন বীমা স্কীম চালু করার সুফল ইতিমধ্যে বাজারে লক্ষ্য করা গেছে। বাজার-গবেষণাকে সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ না করে ক্রমাগত ব্যবহারের মাধ্যমে ইসলামী জীবন বীমার ক্ষেত্রেও সুফল বয়ে আনবে। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে অতি সম্প্রতি 'দেন মোহর' বীমাকে এমন একটি সফলতার দৃষ্টান্ত হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

প্রচলিত বীমা ব্যবস্থা সম্পর্কে যে অভিযোগটি প্রায় করা হয় তা হচ্ছে এর সেবার মান। গ্রাহক সেবার নিম্নমুখী মান মানুষকে বীমার প্রতি বিমুখ করেছে বলে অনেকে মনে করেন। বিশেষ করে বিক্রয়োত্তর সেবা (After Sales Service) নিশ্চিত করা হয় না বলে বীমা গ্রাহকগণ প্রায়ই অসন্তুষ্ট থাকেন। একজন অসন্তুষ্ট গ্রাহক যদি দশজনের নিকট তার অসন্তুষ্টির কথা ব্যক্ত করেন তবে বাকী এই দশজনের নিকট পরবর্তীতে বীমাপত্র বিক্রয় করা প্রায় দু:সাধ্য হয়ে পড়ে।

বীমা পেশাজীবীগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বর্তমান নিয়ে এত বেশি ব্যস্ত থাকেন যে বাজারের দীর্ঘ মেয়াদী ও ভবিষ্যত প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার ফুরসত পান না। যেহেতু বীমা একটি সেবা শিল্প সেহেতু বিক্রয় পূর্ব বা বিক্রয়োত্তর সেবার দিকটিকে খাটো করে দেখার কোন অবকাশ নেই। ইসলামী বীমার পণ্য নিয়ে যারা মাঠে, ময়দানে কাজ করবেন, যারা বিপণন ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত থাকবেন তারা যদি সার্বক্ষণিকভাবে সেবার মান নিশ্চিত করতে সক্ষম হন তাহলে প্রতিটি সন্তুষ্ট গ্রাহক বীমা কোম্পানীর পক্ষে নীরবে বিপণন কর্মী হিসাবে কাজ করে যাবেন। বীমার বাজারে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে এবং বীমা প্রতিনিধিদের দেখে মানুষ দূরে সরে না গিয়ে সানন্দে এগিয়ে আসবে।

প্রচলিত বীমার চতুর্থ সমস্যা হচ্ছে এর অতিরিক্ত Overhed expense বা মাথা পিছু ব্যয়। বিশেষ করে জীবন বীমার ক্ষেত্রে সংগ্রহ ব্যয় বেশি হওয়ার কারণে অনেক দেশে বিতরণ ব্যবস্থার বিকল্প পথ ও পদ্ধতির ব্যবহার করা হচ্ছে। বলা হয় যে জীবন বীমার প্রথম বছরের এক টাকা প্রিমিয়াম আয়ের জন্য এক টাকা দশ পয়সা ব্যয় হয়। বিপণন ও বিতরণ ব্যবস্থায় গুণগত ও পদ্ধতিগত পরিবর্তন আনয়নের মাধ্যমে ব্যয় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হলে ইসলামী বীমার উদ্বৃত্ত প্রচলিত বীমার চাইতে বেশি হবে। এর ফলে বীমাকারী ও বীমা গ্রহীতাগণ অধিকতর উপকৃত হবেন। ইসলামী বীমার ব্যয়ভার কম হলে জনগণ এর প্রতি অধিক আকৃষ্ট হবে। এ ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকে ও ইসলামী বীমার

সমন্বিত ও যৌথ উদ্যোগ অত্যন্ত ফলপ্রসূ ও কার্যকর হবে।

প্রচলিত জীবন বীমার আরো একটি সমস্যা হচ্ছে মাত্রাতিরিক্ত Lapsation বা অতিবাহিত বীমার হার। বলা হয় যে, বীমা বিক্রয়ের প্রথম দুই বছরের মধ্যেই পাঁচ ভাগের প্রায় তিনভাগ পলিসি বন্ধ হয়ে যায়। এ সমস্যাটিকে অবশ্য পৃথক কোনো সমস্যা হিসেবে না দেখে প্রচলিত বীমার ত্রুটিপূর্ণ বিপণন ব্যবস্থার ফল হিসাবে দেখা যেতে পারে। বাজারে নানা ধরনের অনৈতিক পদ্ধতি (Unethical practice) চালু থাকার ফলেই এ সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। কমিশন ভিত্তিক বিপণন ব্যবস্থার যৌক্তিক পরিবর্তন ঘটিয়ে Lapsation- এর হার কমানো সম্ভব বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন।

সম্ভাবনা ও ভবিষ্যত

১৯৭৯ সালে সুদানে প্রথম ইসলামী বীমা কোম্পানী চালু হবার পর বিগত দুই দশকে পৃথিবীর প্রায় কুড়িটি দেশে ৫০টির অধিক ইসলামী বীমা প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে বলে আমরা জানি। আমরা এও জানি যে, পৃথিবীর ৪৫টি দেশে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা চালু হয়েছে। আফ্রিকার সুদানে ইসলামী বীমার প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক সূত্রপাত হলেও বর্তমানে এশিয়া মহাদেশে ইসলামী বীমার ব্যাপক বিস্তৃতি ও প্রসার ঘটেছে। বাংলাদেশ পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হিসাবে স্বাভাবিকভাবে আশা করা যায় যে, ইসলামী বীমার প্রচার, প্রসার ও ব্যাপকতার সম্ভাবনা এদেশে অনেক বেশি।

১. ইসলামী বীমা, প্রচলিত বীমার সাথে পাল্লা দিয়ে এদেশের জনগণের নিকট অধিকতর গ্রহণীয় হবে তখনই যখন গ্রাহকরা উপলব্ধি করবে যে ইসলামী বীমার মাধ্যমে গ্রাহক স্বার্থ অধিকতর সংরক্ষিত হচ্ছে। যখন তারা দেখবে ও বুঝবে যে ইসলামী বীমা শরীয়া সম্মত পদ্ধতিতে কম খরচে গ্রাহকদেরকে অধিকতর সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছে। সে ক্ষেত্রে ইসলাম ধর্মের অনুসারী নয় এমন জনগোষ্ঠীও এই বীমা ব্যবস্থার প্রতি তাদের আস্থা প্রকাশ করবে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় সিংগাপুরের কথা, সেখানে কমপক্ষে দুইটি বীমা প্রতিষ্ঠান তাকাফুল বা ইসলামী বীমা প্রকল্প চালু করেছে। সাম্প্রতিক এক জরিপে দেখা গেছে যে, সিংগাপুরের ইসলামী বীমা গ্রাহকদের প্রায় ২২% হচ্ছে অমুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত। প্রচলিত বীমা ব্যবস্থার সাথে তুলনামূলক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে না পারলে এটি হওয়া সম্ভব নয়।

২. বাংলাদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একাংশের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তি থাকলেও সাধারণ মানুষের মনে 'ইসলাম' সম্পর্কে রয়েছে শ্রদ্ধা মিশ্রিত আবেগ ও ভালোবাসা। যে কোনো ইসলামী উদ্যোক্তার জন্য এটি অত্যন্ত আশার কথা। সাম্প্রতিক কালে পণ্য উৎপাদনকারীরা 'হালাল' শব্দটি ব্যবহারের দ্বারা-এর সুফল পেতে শুরু করেছেন। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকের সফলতা ও গ্রহণযোগ্যতা এ কথা সুপ্রমাণিত করেছে যে ইসলামী বীমার ক্ষেত্রেও সফলতার সম্ভাবনা উজ্জ্বল

হতে উজ্জ্বলতর হবে। সর্ব সাধারণের মধ্যে সচেতনতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষ জীবন বীমার প্রয়োজনীয়তা বেশি বেশি উপলব্ধি করবে এবং শরীয়া সম্মত পদ্ধতিতে জীবন বীমা ব্যবস্থার প্রতি আকৃষ্ট হবে। এ জন্য প্রয়োজন পরিকল্পিত ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে ইসলামী জীবন বীমা সম্পর্কে প্রচার ও এর সফলতাসমূহ তুলে ধরা।

৩. বীমা ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছিল পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে যৌথ উদ্যোগে ঝুঁকি মোকাবেলার একটি পদ্ধতি হিসেবে। বর্তমান কালে ইসলামী বীমা যে পথ ও পদ্ধতিতে বীমা ব্যবস্থার রূপায়ন ঘটাচ্ছে তাকে আমরা Mutual Insurance- এর শরীয়া সম্মত সংস্করণ বলতে পারি। পলিসি মালিকদের উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় 'না- লাভ, না-ক্ষতি' এই ভিত্তিতে বীমা ব্যবস্থা পৃথিবীর উন্নত দেশসমূহে সফলতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। অনেক দেশে মিউচুয়াল ইন্স্যুরেন্স পদ্ধতিতে প্রচলিত বীমা অত্যন্ত সফলতা লাভ করেছে। বিশেষ করে, জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে মিউচুয়াল বীমার সফলতা প্রমাণ করে যে ইসলামী বীমার ক্ষেত্রেও পরিচালনা ব্যয় হ্রাসের মাধ্যমে অধিক উদ্বৃত্ত নিশ্চিত করা সম্ভব। বীমা গ্রহীতাগণ যখন উদ্বৃত্ত অংশ ফেরত পাবেন তখন স্বাভাবিকভাবে প্রিমিয়াম প্রচলিত বীমার প্রিমিয়াম থেকে কম হবে। পলিসি গ্রাহকগণ চুক্তি মাফিক লাভের অংশ যত বেশি পাবেন, ইসলামী জীবন বীমা তত বেশি প্রসার লাভ করবে।

৪. বাংলাদেশে পাঁচটি ইসলামী ব্যাংক তাদের প্রায় ১৫০টি শাখার মাধ্যমে সারা দেশে প্রায় সাত লক্ষাধিক গ্রাহকের সেবায় নিয়োজিত রয়েছে। ইসলামী জীবন বীমা প্রতিষ্ঠান এই সাত লক্ষ পরিবারে অন্তত বিশ লক্ষ পলিসি বিক্রয়ের সুযোগ বা সম্ভাবনা সৃষ্টি করতে পারে। ব্যক্তি বীমা ছাড়াও ইসলামী ব্যাংকসহ সকল ইসলামী প্রতিষ্ঠানে 'গ্রুপ বীমা' চালু করার উদ্যোগ সফলতা লাভ করবে বলে আশা করা যায়। 'গ্রুপ বীমা' শুধু মাত্র ইসলামী প্রতিষ্ঠানসমূহের নয় যে কোনো প্রতিষ্ঠানে এর উপযোগিতা রয়েছে। যেহেতু 'গ্রুপ বীমার' প্রচলন বর্তমানে অত্যন্ত সীমিত আকারে রয়েছে, সেহেতু ইসলামী বীমা প্রতিষ্ঠান সম্ভাবনাময় এই বাজারকে সম্প্রসারিত করার সুযোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে।

৫. আমাদের দেশে স্বাস্থ্য বীমার প্রচলন অতি সম্প্রতি শুরু হয়েছে। গ্রুপ বীমার মত স্বাস্থ্য বীমার সম্প্রসারণ ইসলামী জীবন বীমার জন্য একটি নতুন ও প্রায় অনাবিস্কৃত বাজারের সৃষ্টি করতে পারে। স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি মালিকানাধীন সংস্থা সমূহের সাথে সহযোগিতামূলক চুক্তি ও সমন্বিত উদ্যোগ নেয়া সম্ভব হলে বাংলাদেশের Formal Sector-এ বিশেষ করে চাকুরীজীবীদের মধ্যে স্বাস্থ্য বীমার বাজার সৃষ্টি করা সম্ভব বলে মনে হয়। আমাদের দেশে স্বল্প ও নির্দিষ্ট আয়ের ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বীমা ব্যবস্থার মাধ্যমে

অর্থায়নের উদ্যোগ ফলপ্রসূ হবার সম্ভাবনা অনেক বেশি। ইসলামী জীবন বীমা পদ্ধতির মধ্যেমে এই সম্ভবনাকে বাস্তবে রূপ দেয়া সম্ভব। শুধু চাকুরীজীবী নয় পেশাজীবী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ও সমর্থনে স্বাস্থ্য বীমার বাজার সম্প্রসারিত হতে পারে।

শুধুমাত্র মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীর জনসাধারণ নয় বরং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যেও বীমার চাহিদা রয়েছে। বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি বেসরকারি সংস্থা (Non-government organisations) ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণকারীদের মধ্যে মেয়াদী জীবন বীমা পদ্ধতি অত্যন্ত সফলতার সাথে চালু করেছে। প্রচলিত বীমার বাইরে এসব প্রতিষ্ঠান নিজেরাই এক ধরনের স্ব-বীমা (Self Insurance) পদ্ধতিতে ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণকারী সকল সদস্যের জন্য জীবন বীমা প্রচলনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের পাশাপাশি নতুন একটি তহবিল গঠন করতে সক্ষম হয়েছে। এই তহবিল হতেও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য পুনঃঋণ প্রদান সম্ভব হচ্ছে। ইসলামী ব্যাংকসহ যে সব সাহায্যকারী সংস্থা সূদমুক্ত ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প চালু করেছে সেখানে ঋণ গ্রহীতাদের মধ্যে স্বল্প ব্যয়ে মেয়াদী বীমা প্রচলন করা সম্ভব।

৭. হজ্জ বা উমরাহে গমণেচ্ছুদের জন্য ইসলামী জীবন বীমার বিশেষ পলিসি অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও উপযোগী হতে পারে। ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ ও পেশাজীবীদের সমন্বিত প্রচেষ্টায় ও মতের ভিত্তিতে মসজিদের ইমাম, মাদ্রাসার শিক্ষক প্রভৃতিদের জন্য বিশেষ বীমাপত্র চালু করার উদ্যোগ ফলপ্রসূ হতে পারে। কেন না এতে করে সেই সব জনগোষ্ঠীকে বীমার আওতাভুক্ত করা সম্ভব হবে যারা পূর্বে কখনো বীমা ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করতে অপারগতা ও অনীহা প্রকাশ করেছেন।

৮. সমাজের উচ্চবিত্ত ও ধনী ব্যবসায়ীদের জন্য Annuity বা একক প্রিমিয়াম বীমা বাংলাদেশে চালু করার উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়নি। বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে উঠতি ধনিক শ্রেণীর চাহিদা ও প্রয়োজন মেটাবে Annuity এবং Single Premium policy প্রচলন করার ক্ষেত্রে ইসলামী জীবন বীমা অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে।

৯. ইসলামী বীমার অন্যতম বৈশিষ্ট হচ্ছে এর স্বচ্ছতা। পলিসি গ্রাহকদের অর্থ কিভাবে ব্যয় করা হবে, রিনিয়োগ করা হবে, লাভ কিভাবে বণ্টন করা হবে এসব পরিষ্কারভাবে চুক্তিপত্রে ঘোষণা করতে হবে। এর ফলে সম্ভাব্য গ্রাহকদের মধ্যে আস্থা সৃষ্টি সহজতর হবে। জীবন বীমা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে নেতিবাচক ধারণার মূল কারণ হচ্ছে আস্থার অভাব। স্বচ্ছতার মাধ্যমে আস্থা সৃষ্টি দ্বারা ইসলামী জীবন বীমা জনমনে ইতিবাচক সাড়া ফেলতে সক্ষম হবে বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন।

১০. স্বচ্ছতা ও আস্থা সৃষ্টির জন্য বীমার গ্রাহক ও অপারেটরদের মধ্যে তথ্য প্রবাহ ও যোগাযোগ সার্বক্ষণিকভাবে হওয়া প্রয়োজন। তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ ও ব্যবহারের

দ্বারা ইসলামী জীবন বীমা কোম্পানী প্রতিনিয়ত গ্রাহকদের নিকট সর্বশেষ তথ্য সম্বলিত হিসাব ও কোম্পানীর নতুন প্রডাক্ট ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত করতে সক্ষম হলে ইসলামী জীবন বীমার অগ্রযাত্রা সহজ হবে। ইলেক্ট্রনিক কমার্স, ইন্টারনেট, ওয়বে সাইট ইত্যাদির ব্যবহার ইসলামী জীবন বীমার প্রচার ও প্রসারে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

১১. বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশের বীমা ব্যবসার অগ্রগতি যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে আমরা দেখব যে জীবন বীমার প্রিমিয়াম আয় বৃদ্ধি পেয়েছে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশে জীবন বীমার গ্রস প্রিমিয়াম আয় ছিল ১০০ কোটি টাকার কম কিন্তু গত এক দশকে তা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৬০০ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। প্রাইভেট সেক্টর ও পাবলিক সেক্টর উভয় ক্ষেত্রে এই অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। লক্ষণীয় যে, সাধারণ বীমার গ্রস প্রিমিয়াম ছিল ১৯৯১ সালে প্রায় ২০০ কোটি টাকা। বর্তমানে তা বেড়ে দাড়িয়েছে প্রায় ৪০০ কোটি টাকা। অর্থাৎ জীবন বীমার প্রিমিয়াম প্রবৃদ্ধি সাধারণ বীমার প্রিমিয়াম বৃদ্ধির তুলনায় অনেক বেশি হয়েছে। এই প্রবৃদ্ধি ইসলামী জীবন বীমার ক্ষেত্রে আরো অনেক বেশি হবার সম্ভাবনা উজ্জ্বলতর।

১২. পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে বীমার অগ্রগতি অত্যন্ত অপ্রতুল। যেমন একজন জাপানী গড়ে বছরে জীবন বীমার জন্য প্রায় ১,৭০,০০০ টাকা প্রিমিয়াম দিয়ে থাকে। সেখানে বাংলাদেশে জনপ্রতি জীবন বীমার গড় বার্ষিক প্রিমিয়াম মাত্র ৫০ টাকার মত। এ তথ্য আমাদের আশাহত নয় বরং আশান্বিত করে। কারণ সামনে অনেক বেশি অগ্রসর হবার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রতিবেশি দেশসমূহ যেমন ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকার তুলনায়ও আমাদের প্রিমিয়াম অত্যন্ত কম। ভারতে জন প্রতি বার্ষিক জীবন বীমার প্রিমিয়াম ব্যয় ছয় ডলারের বেশি কিন্তু বাংলাদেশে তা এক ডলারের কম।

১৩. সাধারণ মানুষের আর্থিক সচ্ছলতা যত বাড়বে, জীবন বীমার চাহিদা তত বৃদ্ধি পাবে। আমাদের মাথাপিছু আয়, জিডিপি ইত্যাদি যেমন বাড়ছে তেমনি মুদ্রাস্ফীতির হার এশিয়ার অনেক দেশের তুলনায় কম। জীবন বীমার ক্রম বৃদ্ধির জন্য অর্থনীতির এই চিত্র আমাদের আশান্বিত করে যে, বর্তমান শতাব্দীতে বাংলাদেশে জীবন বীমার চাহিদা ক্রম সম্প্রসারিত হবে।

১৪. অর্থনৈতিক পরিবর্তন আমাদের সমাজ জীবনে প্রভাব ফেলতে শুরু করছে। আমাদের গড় আয়ু বাড়ছে। আগামী দশকে বাংলাদেশে ষাটোর্ধ মানুষের সংখ্যা এক কোটি ছাড়িয়ে যাবে। বয়স্কদের আর্থিক নিরাপত্তার জন্য অবশ্যই বীমা স্কিমের প্রয়োজন হবে। বৃদ্ধ বয়সে পেনসন প্রদানের জন্য ভারতসহ পৃথিবীর অনেক দেশে Group Supper annuation স্কিম চালু করা হয়েছে। বাংলাদেশে এ ধরনের স্ক্রিম চালু করার জন্য ইসলামী জীবন বীমা উদ্যোগ গ্রহণ

করতে পারে। বৃদ্ধ বয়সে পুত্র কন্যার মুখাপেক্ষী হতে অনেকেই অপছন্দ করেন এবং আগামীতে ছেলে মেয়েরা বৃদ্ধ পিতা মাতার দায় দায়িত্ব নেবে এমন মনমানসিকতা লোপ পেতে থাকবে। পেনসন বীমার ব্যাপক প্রচলন এ অবস্থা হতে উত্তরণের সহায়ক হবে।

১৫. সর্বশেষ কিন্তু সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ইসলামী জীবন বীমার সফলতা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করবে এই পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব ও উপযোগিতার ভিত্তিতে। প্রচলিত জীবন বীমার তুলনায় ইসলামী জীবন বীমা যদি অধিকতর কল্যাণমুখী, গণমুখী ও সেবামুখী না হয় তবে শুধুমাত্র ইসলামী হওয়ার কারণেই তা সফল হবে না। মুসলমান হিসেবে যেহেতু আমাদের বিশ্বাস যে ইসলাম শ্রেষ্ঠতম ধর্ম তাহলে অবশ্যই মানতে হবে যে, ইসলামের নীতিমালা অনুসারে পরিচালিত যে কোন প্রতিষ্ঠান, যে কোন পদ্ধতি শ্রেষ্ঠতর নয় বরং শ্রেষ্ঠতম (The Best) হবে। বাংলাদেশে সম্প্রতি ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ পর পর কয়েক বছর দেশের শ্রেষ্ঠতম ব্যাংক হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। এ উদাহরণ আমাদের বক্তব্যকে সমর্থন করে। এর ব্যতিক্রম হলে সে ক্রটির দায়-দায়িত্ব হবে প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে ক্রটি বা অব্যবস্থাপনার, ইসলামী পদ্ধতির নয়।

ইসলামী দণ্ডবিধি

ড. আবদুল আযীয আমের

॥ ২ ॥

কযফ তথা অপবাদ

অপবাদ বা কারো প্রতি মিথ্যা কলংক আরোপজনিত অপরাধের শাস্তি বিধানের ভিত্তি হলো সূরায়ে নূর এর ৪ নম্বর আয়াত। মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, 'যারা সতী সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে কিন্তু চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে পারে না, তাদেরকে আশিটি কষাঘাত লাগাবে এবং কখনো তাদের সাক্ষী গ্রহণ করবে না, এরাইতো সত্যত্যাগী।'

ব্যভিচারের অপবাদ আরোপকারী এবং ভিত্তিহীনভাবে পৈত্রিক সম্পর্ক অস্বীকারকারীর শাস্তি সম্পর্কে ফকীহদের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই। এ দুটি ছাড়া আর যতো অপবাদ আছে এগুলো কযফ এর দণ্ডারোপের পর্যায়ভুক্ত নয়। অন্যান্য অপবাদে বিচারের আওতায় শাস্তি দেয়া যেতে পারে কিন্তু হদ প্রয়োগ করা যাবে না।

কযফ এর দণ্ড প্রয়োগ করার শর্ত হলো, কাযেফ (মিথ্যা অপবাদ আরোপকারী) এর প্রাপ্ত বয়স্ক সজ্ঞান এবং যার উপরে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা হয়েছে তার বিবাহিত বা মুহসিন হওয়া। অপবাদ এর ক্ষেত্রে মুহসিন এবং ব্যভিচারের ক্ষেত্রে মুহসিন হওয়ার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

ব্যভিচারী সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে এমন ব্যক্তিকেই মুহসিন বলা হবে যার প্রাপ্ত বয়স্ক সজ্ঞান স্বাধীন মুসলমান অবস্থায় কোন নারীর সাথে বৈধ পন্থায় বিয়ে হয়েছে এবং সেই বৈধ স্ত্রীর সাথে তার মিলন ঘটেছে। পক্ষান্তরে মিথ্যা অপবাদ আরোপের ক্ষেত্রে যার উপর অপবাদ আরোপ করা হয়েছে তার বিবাহিত অবস্থায় স্ত্রীগমণ আবশ্যিক নয় শুধু মুসলমান, বালেগ, আকেল, স্বাধীন এবং অন্যদের দৃষ্টিতে সচ্চরিত্রের অধিকারী হওয়াই যথেষ্ট। এ ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ আরোপকারীর শাস্তি ৮০টি কষাঘাত। কুরআন কারীম পরিষ্কার ভাষায় (ছামানিয়াতা জালদা) ৮০ কষাঘাত শব্দ উল্লেখ করেছে। এ ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই। সকল ফকীহ এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন। মিথ্যা অপবাদ আরোপকারীকে ৮০ কষাঘাত ছাড়াও তার আরো শাস্তি হলো, এ দণ্ডে দণ্ডিত হলে তার কোনো সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ 'কখনো তাদের কোনো স্বাক্ষ্য গ্রহণ

করো না' বলে কুরআন কারীম দ্ব্যর্থহীন ফয়সালা দিয়েছে। হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে, 'এক মুসলমান অপর মুসলমানের জন্য সাক্ষ্য দেয়ার ব্যাপারে খুবই ন্যায়নিষ্ঠ কিন্তু তাদের স্বাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় যারা মিথ্যা অপবাদ আরোপের অপরাধে দণ্ডিত হয়েছে।'

যদি মাকযুফ (যার উপর অপবাদ আরোপ করা হয়েছে) কাযেফকে (অপবাদ আরোপকারী) ক্ষমা করে দেয় তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে কি না এ ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা যায়। ইমাম আবু হানিফা র. এবং অন্যান্য ফকীহদের মতে মিথ্যা অপবাদকারীকে অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি ক্ষমা করে দিলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না, এই অপবাদের সংবাদ শাসকের কাছে পৌছুক বা না পৌছুক। অনেকেই বলেন, মিথ্যা অপবাদ দেয়ার সংবাদ যদি বিচারক জেনে যায় তাহলে আর অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি অপরাধীকে ক্ষমা করতে পারবে না। কারণ এ ক্ষেত্রে ক্ষমা করে দিলেও অপরাধীর শাস্তি রহিত হবে না। যদি বিচারক না জানে তাহলে ক্ষমা প্রযোজ্য হতে পারে।

এ ব্যাপারে ইমাম মালেক র. একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর কোন অভিমত ইমাম শাফেয়ীর র. মতের অনুরূপ। এর বিপরীতে তিনি এটাও বলেছেন, যদি এ সংবাদ বিচারক জানতে পারে তাহলেও ক্ষমা প্রযোজ্য হবে। তা ছাড়া এ কথাও তিনি বলেছেন যে, বিচারকের জানার পরও ক্ষমা প্রযোজ্য হতে পারে যদি অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি তার মান অক্ষুণ্ন রাখার ব্যাপারটিকে চেপে রাখার জন্যে অপরাধীকে ক্ষমা করে দিতে বিচারকের কাছে আবেদন করে। এটিই ইমাম মালেক র. এর সর্বশেষ ও বহুল আলোচিত মত।

মিথ্যা অপবাদকারীকে ক্ষমা করার বৈধতা নিয়ে সৃষ্ট মতানৈক্যের মূল উৎস হলো, কযফ তথা অপবাদজনিত অপরাধের অবস্থান জনিত পর্যায়। এখানে মূল প্রশ্নটি হলো, অপবাদ আসলে কোন পর্যায়ভুক্ত অপরাধ?

যারা বলেন, কযফ (অপবাদ) হক্কুল্লাহ (আল্লাহর অধিকার)! তাদের দৃষ্টিতে যিনার মতো এক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ক্ষমা করে দিলেও অপরাধী ক্ষমা পাবে না। আর যাঁরা কযফকে হক্কুল ইবাদ (মানুষের অধিকার) বলেছেন, তাঁদের দৃষ্টিতে এ ক্ষেত্রে ক্ষমা প্রযোজ্য। আর যাঁদের কাছে কযফ একই সাথে হক্কুল্লাহ ও হক্কুল ইবাদত বিনষ্টকারী তাদের মত হলো, যদি অপবাদ আরোপের সংবাদ বিচারকের জ্ঞাত হয়ে যায় তাহলে আর ক্ষমা প্রযোজ্য হবে না। আর যাঁদের দৃষ্টিতে এখানে আল্লাহ ও বান্দার হক উভয়টি রয়েছে তবে বান্দার হক প্রবল তাঁদের দৃষ্টিতে বিচারকের কাছে অপবাদ আরোপের সংবাদ পৌছে গেলেও ক্ষমা প্রযোজ্য হবে।

বস্তুত এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, অপবাদকারীর অপবাদ যদি আরোপিত ব্যক্তি স্বীকার করে নেয় তাহলে অপবাদ আরোপকারীর শাস্তি রহিত হয়ে যাবে।

আমি মনে করি, কযফ (মিথ্যা অপবাদ) এর ধরণ ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এটি একটি মানবাধিকার (Public Right)। সামাজিক ব্যবস্থা ঠিক রাখার জন্য কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হলো সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের চিহ্নিত করে তাদেরকে শাস্তির আওতায় নিয়ে আসা। যাতে করে সামাজিক স্বস্তি ও শান্তি স্থিতিশীল থাকে।

সমাজের কারো চরিত্রে কলংক বা অপবাদ আরোপ করা প্রকৃতপক্ষে মানুষের ইজ্জতের উপর আঘাত করার নামান্তর। এটিকে সামাজিক অধিকার হরণের পর্যায়ভুক্ত মনে করতে হবে। এমনটি মনে করার দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, এ ক্ষেত্রে ক্ষমা করে দিলেও অপরাধীর বেলায় ক্ষমা প্রযোজ্য হবে না। অপরাধীর শাস্তি রহিত করা হবে না।

মদপান

কুরআনুল কারীম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় (শরাব) মদপানকে হারাম (নিষিদ্ধ) ঘোষণা করেছে।

'হে মুসলমানগণ, মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর; যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।' (সূরা আল মায়েদা-৯০)

বিদায় হজ্জের সময় নবী করীম স. কে মদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'মদ সর্বৈব হারাম। তা ছাড়া যেসব জিনিস নেশাগ্রস্ত করে সবই হারাম।'

হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। নবীযে[১] আসল (মধুর সাথে পানির তৈরী সিরকা) ও তাবা (যব ও গমের দ্বারা তৈরী মদ) সম্পর্কে রসূল স. এর কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, যে সব জিনিস মানুষকে নেশাগ্রস্ত করে সেসবই হারাম। ইমাম মুসলিম র. ইবনে ওমর রা. সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেন যে, রসূল স. বলেন, 'প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই খমর তথা মানুষকে নেশাগ্রস্ত করে আর প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী বস্তুই হারাম।[২]

মদ হারাম সম্পর্কে এ জাতীয় অসংখ্য নস রয়েছে। বস্তুত মদ হারাম হওয়াটা একই সাথে কুরআন ও হাদীসের অকাট্য প্রমাণাদিতে সাব্যস্ত। মদ হারাম হওয়ার ব্যাপারে কারো সংশয় সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এ ব্যাপারেও কোন সন্দেহ নেই যে আঙ্গুর দিয়ে যে মদ তৈরি করা হয় তার প্রতিটি ফোঁটা হারাম। তবে নবীয (সিরকা) এর ব্যাপারে মতভিন্নতা রয়েছে। এক্ষেত্রেও এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই যে, যে পরিমাণ নবীয পানে নেশা সৃষ্টি করে সে পরিমাণ পান করা হারাম কিন্তু সামান্য যা নেশাগ্রস্ত করে না তার পরিমাণ সম্পর্কে মতভিন্নতা দেখা যায়। হিজায তথা আরব উপদ্বীপের অধিকাংশ ফকীহ ও মুহাদ্দিসের দৃষ্টিতে এ পরিমাণও হারাম। কিন্তু ইরাকের ইবরাহীম নখয়ী, সুফিয়ান ছাওরী, ইবনে আবি লায়লা, শুরাইক, ইবনে শুবরুমা এবং আবু হানিফা র. বলেন, আঙ্গুর ছাড়া অন্যান্য পানীয় দ্রব্যের মধ্যে নেশা সৃষ্টিকারী পরিমাণ হারাম কিন্তু মূল পানীয় হারাম নয়।[৩]

এতোক্ষণ মদ পানের অপরাধ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। এখন মদ পানের শাস্তির কথায় আসা যাক। আল কুরআনে মদ পান সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোন শাস্তির কথা বলা হয়নি। তদ্রুপ রসূল স. ও মদ পানের শাস্তির ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট করে কিছু বলেননি। শরাব পানের অপরাধে রসূল স. নির্দিষ্ট শাস্তিবিধান না করে জুতা, খেজুরের শাখা বা কাপড় পাকিয়ে রশির মতো করে তা দিয়ে মদ্যপকে পিটিয়েছেন। আবু দাউদে বর্ণিত হয়েছে, রসূল স. এর কাছে একদিন এক মদ্যপকে নিয়ে আসা হলো। তিনি বললেন,

ওকে পেটাও। হযরত আবু হুরায়রা বলেন, আমাদের একজন তখন সেই অপরাধীকে জুতা দিয়ে পেটাচ্ছিল, কেউ হাত কেউবা কাপড় দিয়ে আঘাত হানছিল। আবু হুরায়রা আরো বলেন, এরপর রসূল স. বললেন 'ওকে তিরষ্কার করো'। এ কথা শোনার পর লোকেরা ওকে বলতে লাগলো, ওহে তোমার কি আল্লাহর ভয় নেই? তুমি কি আল্লাহকেও ভয় করো না? মাতাল হয়ে রসূলের সামনে আসতে তোমার লজ্জা করলো না? এই ঘটনা সম্পর্কে ইবনে ফরহুন বলেন, এটা হলো মৌখিক শাস্তি। এ কথা থেকে এটিও প্রমাণিত হয় যে, হদ এর সাথে (তাযির) শাস্তি একত্র হতে পারে।

একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, সাহাবায়ে কেরামের ধারণা রসূল স. এর সময় মদ পানের অপরাধে ৪০ ঘা মারা হতো। 'নাইলুল আওতারে' বর্ণিত হয়েছে, রসূল স. মদ পানের অপরাধে মদ্যপকে দুটি খেজুর শাখা একত্র করে ৪০ বার প্রহার করেছেন। আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, মদ পানের অপরাধে রাসুল স. জুতা দিয়ে ৪০ বার প্রহার করেছেন। হযরত উমর জুতার বদলে চাবুক ব্যবহার করেছেন। অপর এক বর্ণনায় আবু সাঈদ খুদরী বলেন, রসূল স. শরাব পানের অপরাধে ৪০ বার প্রহার করেছেন। ইমাম শাফেয়ী র. এই বর্ণনার ভিত্তিতে ফয়সালা দিতেন। সায়েব বর্ণনা করেন, মদ্যপায়ীকে রসূল স. এর সময়ে, হযরত আবু বকর ও উমর রা.-এর প্রথম যুগে হাত, চাদর ও জুতার দ্বারা প্রহার করা হতো। অতপর হযরত উমর এটিকে ৪০ চাবুকে রূপান্তরিত করেন। কিন্তু মানুষের মধ্যে ফিসক ও অপরাধ প্রবণতা যখন বেড়ে গেলো তখন তিনি মদপানের শাস্তি ৮০ চাবুক নির্দিষ্ট করে দেন।

উল্লেখিত বর্ণনার ভিত্তিতে মদ পানের শাস্তির ব্যাপারে ফকীহদের সর্বসম্মত অভিমত হলো ৮০ চাবুক। ইমাম শাফেয়ী, আবু ছাওর ও দাউদ জাহেরী বলেন, মদ পানের শাস্তি ৪০ বেত্রাঘাত। জমহুরে ফুকাহার দলীল হলো, হযরত উমরের শাসনামলে মানুষের মধ্যে যখন অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা গেলো তখন তিনি মদ পানের শাস্তির ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করলেন। তখন বিভিন্ন সাহাবী তাঁকে মদ পানের শাস্তি ৮০ চাবুক নির্ধারণ করার পরামর্শ দিয়ে বলেন, এটিকেও অপবাদ আরোপের শাস্তির অনুরূপ করে নিন। এ প্রসঙ্গে হযরত আলী রা. থেকে এ কথাও বর্ণিত হয়েছে, 'যখন কোন মানুষ মদ পান করে তখন তার হুঁশ জ্ঞান থাকে না। আর যখন হুঁশ জ্ঞান ও বোধ ঠিক থাকে না তখন যাচ্ছে তাই বকাঝকা করে। আর যখন যাচ্ছে তাই বকে তখন অন্যের উপর অপবাদ আরোপ করে। ফলে এই পরামর্শের ভিত্তিতে হযরত উমর মদ পানের শাস্তি ৮০ চাবুক নির্ধারণ করেন। যদিও তিনি এর আগে মদ পানের অপরাধে ৪০ বার চাবুক মারতেন।

অন্যদের দলীল হলো, রসূল স. মদ পানের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোনো শাস্তি নির্ধারণ করেন নি বরং অপরাধীকে অনির্দিষ্ট পরিমাণ মারপিট করা হতো। সাহাবায়ে কেরাম রসূল স. এর এই ধরনের শাস্তি গুণে দেখেছেন, প্রহারের পরিমাণ ৪০ বার হয়েছে। একটি বর্ণনাতে উল্লেখ রয়েছে, রসূল স. ৪০বার মদ্যপকে প্রহার করেছেন।[৫]

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে একথা আমরা বলতে পারি যে, মদ পানের শাস্তি ৪০ চাবুক থেকে ৮০ চাবুকে উন্নীত করেন হযরত ওমর রা.। রসূল স. এর পর সাহাবায়ে কেরামের পরামর্শে তিনি এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

এ কারণেই হযরত আলী রা. যখন হযরত উমর রা. কে ৮০ চাবুক মারার পরামর্শ দিলেন তখন তিনি এ কথাও বললেন, 'এটিই মদ পানের হদ' যা রসূল স. এর পর সাহাবায়ে কেরামের পরামর্শের ভিত্তিতে সাব্যস্ত হয়েছে।'[৫]

যে সব বর্ণনায় রসূল স. মদ পানের অপরাধে তাঁর সময়ে কোন সুনির্দিষ্ট শাস্তি দেন নি সেইসব বর্ণনাকে যদি গ্রহণ করা হয় তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, নবীজী স. এর যুগে শরাব পানের অপরাধে সুনির্দিষ্ট কোন 'হদ' ছিল না, ছিল কেবল মাত্র তাযির। কারণ শরীয়তের পরিভাষায় অনির্দিষ্ট সাজাকে তাযির (শাস্তি) বলা হয়।

যে সব বর্ণনায় বলা হয়েছে রসূল স. এর সময় শরাব পানের অপরাধের শাস্তি চল্লিশ চাবুক ছিল নির্ধারিত যেমনটি ইমাম শাফেয়ী বলেন, যদি সেইসব বর্ণনা গ্রহণ করা হয় তাহলে এ প্রশ্নটি সামনে চলে আসে যে, এমতাবস্থায় এ সাজাকে কি তাযির বলা হবে না 'হদ'! যেহেতু সাহাবাদের সময়েই ৪০ চাবুকের চেয়ে বেশি শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছিল তাই অতিরিক্ত প্রহারগুলোকে হদ বলা যাবে না তাযির বলতে হবে।

শরীয়ত শাসকদেরকে এ অধিকার দিয়েছে, তারা যদি হদ প্রয়োগ করে লোকদের অপরাধ থেকে নিবৃত্ত না করতে পারে তাহলে হদ এর সঙ্গে তাযিরও যোগ করতে পারে।

ইরতিদাদ বা ধর্মদ্রোহিতা

ইসলাম গ্রহণ করার পর পুনরায় বেঈমান হয়ে যাওয়াকে বলা হয় ইরতিদাদ। ইসলাম ত্যাগ করে অন্য কোন ধর্মমত গ্রহণ করুক বা না করুক তাতে কোন ফারাক নেই।[৬] কুরআন করীমে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'তোমাদের মধ্যে যে কেউ নিজের দীন ত্যাগ করে এবং কাফের হিসেবে মৃত্যুবরণ করে দুনিয়ায় ও আখেরাতে এই ধরনের লোকদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। তারাই জাহান্নামী, জাহান্নামে তারা অনন্তকাল থাকবে।'

রসূল স. বলেন, 'যে মুসলমান দীন পরিবর্তন করে (তথা ইসলাম ত্যাগ করে) তাকে হত্যা কর।'

'নবী করীম স. যখন হযরত মুআয ইবন জাবালকে ইয়ামনের শাসক নিযুক্ত করে পাঠাচ্ছিলেন তখন তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'মুরতাদ নারী পুরুষকে দীনের দিকে ফিরে আসার দাওয়াত দেবে, ফিরে আসতে অস্বীকার করলে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করবে।'

এ হাদীস ছাড়াও বহু সংখ্যক সাহাবী সূত্রে মুরতাদের মৃত্যুদণ্ড সম্পর্কিত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাঁদের মধ্যে হযরত আবুবকর, হযরত উমর, হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত মুআয ইবনে জাবাল, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম

রা. থেকে এ সংক্রান্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাঁদের বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে কোন সাহাবীই দ্বিমত পোষণ করেন নি। বস্তুত মুরতাদের মৃত্যুদণ্ড সম্পর্কে সকল সাহাবীর ঐকমত্য রয়েছে।[৭]

উল্লেখিত প্রমাণদ্বারা সাব্যস্ত হয় ইরতিদাদের অপরাধ কুরআন হাদীসের দৃষ্টিতে জঘন্যতম অপরাধ। এবং এই অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হওয়াটা সুন্নাহ ও ইজমায়ে সাহাবা দ্বারা প্রমাণিত।

মুরতাদ যদি বহু লোক এক সঙ্গে হয়ে থাকে এবং ইসলামী শাসন ব্যবস্থার অধীনে সমকালীন শাসকের দ্বারা এরা শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তাহলে এই ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে শাসকের যুদ্ধ করার প্রয়োজন নেই। তখন শাসকের দায়িত্ব হলো তাদের মুরতাদ হওয়ার কারণ উদঘাটন করা। কারণ অনুসন্ধানে যদি অনুমিত হয় যে, এরা দীনের ব্যাপারে কোন সন্দেহ সংশয়ের কারণে দীন ত্যাগ করেছে, তাহলে কুরআন হাদীসের অকাট্য দলীল প্রমাণ উপস্থাপন করে তাদের সংশয় নিরসন করতে হবে। এবং তাদেরকে পুনরায় দীন ইসলামে ফিরে আসার জন্য অবকাশ দিতে হবে। যদি তারা তওবা করে তবে তাদের তওবা গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে এবং তারা পূর্বের মতোই মুসলমান হিসেবে স্বীকৃতি পাবে।

মুরতাদের তওবা করানোর ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে মতভিন্নতা রয়েছে। অনেক ফকীহর মত হলো, মুরতাদকে শাস্তি দেয়ার আগে তাকে তওবা করার জন্যে প্রস্তাব করা ওয়াজিব। ইমাম মালেক, সুফিয়ান ছাউরী ও ইমাম আউযায়ী র. এ মত পোষণ করেন। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ র. থেকেও এ মতের সমর্থনে একটি বক্তব্য আছে।

অবশ্য ইমাম মালেক র. বলেন, কেউ যদি গোপনে ধর্মদ্রোহিতায় লিপ্ত হয় তাহলে তাকে শাস্তি দেয়ার আগে তওবা করানোর চেষ্টা করা জরুরী নয়। বস্তুত তওবা করার আগ্রহ যদি মুরতাদের পক্ষ থকে হয় তাহলে তওবা করানোতে দোষ নেই। এ ছাড়া প্রকাশ্য ধর্মদ্রোহিদেরকে তওবা করার সুযোগ দিতে হবে যেমনটি উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইমাম আহমদ র. থেকে এমন একটি বক্তব্যও রয়েছে যে, মুরতাদকে তওবার প্রস্তাব করা ওয়াজিব নয়, মুস্তাহাব। ইমাম শাফেয়ী র. এরও অপর একটি বর্ণনা এমন রয়েছে। 'যে দীন পরিবর্তন করেছে তাকে হত্যা করো' এ হাদিসটিকে তাঁরা প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করেছেন। এ হাদীসের মধ্যে তওবার প্রস্তাব করার কোন উল্লেখ নেই। কিন্তু যাঁরা তওবার প্রস্তাব করাকে জরুরী বলেছেন, তাঁরা একজন মুরতাদ মহিলার ঘটনা প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন। 'সেই মহিলাকে হত্যা করার আগে রসূল স. তার কাছে তওবা করার প্রস্তাব পেশ করার নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন, সে যদি তওবা করতে অস্বীকার করে তাহলে তাকে হত্যা করবে।' সেই মামলায় অভিযুক্ত মহিলাকে তওবা করার সুযোগ দেয়ার পরই কেবল তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।[৮]

কোন মুরতাদ যদি তার ধর্মদ্রোহিতার উপর জোর দিতে থাকে তবে উপরে উল্লেখিত

দলীলের ভিত্তিতে তাকে হত্যা করা ওয়াজিব।[৯] অবশ্য এ ক্ষেত্রে মতভেদ আছে, তাকে তাৎক্ষণিকভাবে হত্যা করা হবে না আরো অবকাশ দেয়া হবে? অনেকেই বলেন, মুরতাদ তওবা করতে অস্বীকৃতি জানালে তাকে তখনি হত্যা করা উচিত। যাতে আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়নে বিলম্ব না ঘটে। কেউ বলেন, এ ধরনের মুরতাদকে তিন দিনের অবকাশ দেয়া উচিত, এর মধ্যে যদি তার তওবা করার সৌভাগ্য হয়। শেষোক্ত মতের পক্ষে একটি ঘটনাকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, যাতে বলা হয়, 'নবী করীম স. মুসতাওরাদে আজালীকে তিন দিনের অবকাশ দিয়েছিলেন। এরপর তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেন।'[১০]

আমার মনে হয় মুরতাদদের তিন দিনের অবকাশ দেয়ার মধ্যে যুক্তি আছে। এই তিন দিনের মধ্যে তারা চিন্তা ভাবনা করে হয়তো দীনের পথে ফিরে আসতেও পারে। দীনের পথে ফিরে আসার সম্ভাবনার কারণে আমার কাছে তিন দিনের অবকাশ দেয়ার মতটি অধিক যৌক্তিক মনে হয়। কেন না অবকাশের সুযোগ দেয়ার পরও সে যদি তওবা করে দীনের পথে ফিরে না আসে তাহলে শাস্তির হাত থেকে নিস্কৃতি লাভের কোনো সুযোগই তার থাকে না। বস্তুত অবকাশ দেয়ার মধ্যে যেহেতু কল্যাণের সম্ভাবনা আছে ফলে ক্ষতির কোন আশংকা নেই।

কোন নারী যদি মুরতাদ হয়ে যায় তাহলে তার ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে মতভিন্নতা আছে। তাকেও কি পুরুষ মুরতাদের মতো মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে ?

জমহুর (অধিকাংশ) ফকীহদের অভিমত হলো, ইরতিদাদের প্রশ্নে নারী পুরুষ সমান। হযরত আবু বকর রা. হযরত আলী রা. ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, আবুল লাইছ ও ইমাম আহমদ র. এমত ব্যক্ত করেন। ইমাম আবু হানিফা র. বলেন, নারী মুরতাদকে হত্যা করা যাবে না, তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া যেতে পারে এবং শাস্তি দেয়ার মাধ্যমে তাকে দীনের পথে ফিরে আসতে বাধ্য করতে হবে। শাস্তির প্রক্রিয়া হলো, প্রতিদিন জেলখানা থেকে বের করে ইসলামের দাওয়াত পেশ করতে হবে। সে যদি ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে পুনরায় বন্দী করতে হবে। এভাবে তাকে দীনে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা ততোদিন চালাতে হবে যতোদিন এই নারী মুরতাদ দীনের পথে ফিরে না আসে।

ইমাম আবু হানিফা র. এ ক্ষেত্রে দলীল হিসেবে একটি হাদিস পেশ করেন। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, 'যুদ্ধাবস্থায় কোন নারীকে হত্যা করো না।' ইমাম আবু হানিফা মুসলিম মুরতাদ নারীকে এমন নারীর সাথে তুলনীয় বলেছেন যে শুরু থেকেই কাফের। পক্ষান্তরে জমহুরে ফুকাহার দলীল এমন একটি হাদীস যাতে বলা হয়েছে. 'যে দীন ত্যাগ করলো তাকে হত্যা করো।' সেই সাথে তাঁরা এ হাদীসকেও দলীল হিসেবে পেশ করেন, 'তিনটি কারণ ছাড়া কোন মুসলমানকে হত্যা করা বৈধ নয়। এক. বিবাহিত ব্যভিচারি ও ব্যাভিচারিনী, দুই. অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যাকারী, তিন. দীন ত্যাগকারী তথা ধর্মদ্রোহী।' হাদীসে এ কথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, রসূলের যুগে এক মহিলা মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। রসূল স. তার ব্যাপারে নির্দেশ দিলেন, 'তার সামনে দীন পেশ

করা হোক; সে যদি দীন গ্রহণ করে তাহলে তো খুব ভালো নয়তো তাকে হত্যা করো।' **বস্তুত নারী ও পুরুষের মতোই শরীয়তের আওতাভুক্ত** (Responsible Person)। সে যদি সত্য ধর্মকে ত্যাগ করে বাতিলকে গ্রহণ করে তাহলে পুরুষকে হত্যা করার মতো তাকেও হত্যা করা ওয়াজিব।[১১]

আমার দৃষ্টিতে ইরতিদাদের (ধর্মদ্রোহিতার) ব্যাপারে নারী পুরুষের মধ্যে পার্থক্য করার সুযোগ নেই। এ ব্যাপারে জমহুরের উপস্থাপিত দলীল প্রমাণ বেশি মজবুত। মুরতাদ নারীকে কাফের নারীর সাথে তুলনা করা সঠিক নয়।

বিদ্রোহ

ফকীহদের দৃষ্টিতে বিদ্রোহীদের সংগা হচ্ছে: এমনসব লোক যারা শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, মুসলমানদের বিরোধিতা করে, অথবা নিজেদের তৈরি কোন অনৈসলামিক মতাদর্শ গ্রহণ করে। তারা এসব করার পক্ষে দলীল প্রমাণও পেশ করে। সেই সাথে মুসলমান বা মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধাচরণ করার মতো শক্তি সামর্থও তারা অর্জন করে।[১২] বিদ্রোহীদের সম্পর্কে যেসব প্রমাণ ও দলীল রয়েছে তন্মধ্যে অন্যতম এই আয়াত।

'দুদল মুমিন ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে। তাদের একদল অপর দলের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করলে যারা বাড়াবাড়ি করে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আল্লাহর আদেশের দিকে ফিরে আসে। যদি তারা ফিরে আসে তাহলে তাদের মধ্যে ন্যায়ের ভিত্তিতে ফয়সালা করবে এবং সুবিচার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায় বিচারকারীদের পছন্দ করেন।'[১৩]
(সূরা হুজুরাত, আয়াত-৯)

হযরত আনাস ও হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। রসূল স. বলেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ হবে, এমন কিছু লোক থাকবে যারা ভালো ভালো কথা বলবে কিন্তু তাদের কাজ কর্ম হবে মন্দ। তারা এভাবে দীন থেকে বেরিয়ে যাবে তীর যেমন শিকারের দেহভেদ করে বেরিয়ে যায়। তারা ততক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যাবর্তন করবে না যতক্ষণ না তীর ধনুকে ফিরে আসে। এরা সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট। সুসংবাদ তাদের জন্য যারা এদেরকে হত্যা করবে অথবা এদের হাতে নিহত হবে। এরা মানুষকে আল্লাহর কিতাবের দিকে আহ্বান করবে কিন্তু আল্লাহর কিতাবের সাথে এদের কোন সম্পর্কই থাকবে না। যে ব্যক্তি এদের হত্যা করবে সে এদের তুলনায় আল্লাহর বেশি নৈকট্য অর্জন করবে।'

হযরত আ'মাশ খাইছামা থেকে এবং খাইছামা সুয়াইদ ইবনে গাফালা থেকে হযরত আলী রা. সূত্রে এ হাদিস বর্ণনা করেন। সুয়াইদ বলেন, 'আমি হযরত আলী র.কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি যখন রসূল স. সূত্রে কোন হাদিস লোকজনকে বলি, সে ক্ষেত্রে তোমাদের জেনে রাখা উচিত, আমি রসূল স. এর বরাতে কোন গলদ কথার উদ্ধৃতি দেবো তার তুলনায় আমার পক্ষে এটা সহজ যে আমি আসমান থেকে পড়ে যাব,

এবং পাখপাখালী আমার শরীরের গোশত টুকরো টুকরো করে খেয়ে ফেলবে।'

বস্তুত আমরা পরস্পর কথা বলেছিলাম যে, যুদ্ধ হলো এক ধরনের কূটকৌশল। আমি রসূল স.কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, শেষ যামানায় এমন এক জনগোষ্ঠীর উদ্ভব হবে যারা স্বল্পায়ু ও স্বল্প বুদ্ধি সম্পন্ন হবে। তারা এমন সব কথাবার্তা বলবে যা অন্যদের চেয়ে ভালো কিন্তু তাদের ঈমান তাদের কণ্ঠনালীর ভিতরে প্রবেশ করবে না। তারা দীন থেকে এভাবে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর শিকারের দেহ ভেদ করে বেরিয়ে যায়। তোমরা যদি তাদের মুখোমুখি হও তাহলে তাদের হত্যা করে ফেলো। যে তাদের হত্যা করবে সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে এর প্রতিদান পাবে।'

সাহাবায়ে কেরামের কেউ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেননি যখন যুদ্ধ ছাড়া তাদের সৎপথে ফিরিয়ে আনার কোন কার্যকর ব্যবস্থা না থাকে। যারা মুসলিম শাসক ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে সকল সাহাবী একমত ছিলেন।[১৪]

বিদ্রোহীদের ব্যাপারে শরীয়তের নির্দেশ অবস্থা ভেদে বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে

কোন বিদ্রোহী দল যদি ইসলামের মৌলিক আকীদা অক্ষুণ্ন রেখে মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধাচরণ কল্পে সশস্ত্র যুদ্ধের সূচনা না করে অথবা বিদ্রোহীরা যদি নির্দিষ্ট কোন স্থানে জমায়েত না হয় বরং তারা এমন নাগরিকের মতোই বসবাস করে যেখানে শাসক ইচ্ছা করলেই তাদের কাছে পৌছুতে পারে তাহলে তাদের সাথে সংঘর্ষ পরিহার করে তাদের অবস্থাতেই তাদেরকে থাকতে দিতে হবে এবং অধিকার ও শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে তারাও শিষ্ট নাগরিকদের মতোই সুবিধা ভোগ করবে।[১৫]

তারা যদি শিষ্ট নাগরিকদের মধ্যে বসবাস করে মুসলিম সমাজে তাদের বিভ্রান্তিকর আকীদা বিশ্বাস প্রকাশ্যে প্রচার করতে থাকে তাহলে শাসকের কর্তব্য হলো সর্বাগ্রে তাদের আকীদাগত বিভ্রান্তি দূর করা যাতে তারা সত্যকে মেনে নিতে এবং সর্বসম্মত পথে ফিরে আসতে পারে। কিন্তু এরপরও যদি তারা বিভ্রান্তিকর আকীদা পরিহার না করে তবে শাসকের জন্য বৈধ হবে পরিস্থিতি অনুযায়ী তাদের যে কোন দণ্ডে দণ্ডিত করা।[১৬]

কিন্তু বিদ্রোহী দল যদি শিষ্ট ও সুশীল সমাজ ছেড়ে স্বতন্ত্র কোন জায়গা বা এলাকাতে জমায়েত হয়, তবুও ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা শাসকের অধিকার ও প্রাপ্য দিতে অস্বীকার না করবে এবং শাসকের আনুগত্য করতে অস্বীকৃতি না জানাবে।

হযরত আলী রা. এর আমলে খারেজীদের একটি উপদল সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নাহরওয়ান এলাকায় গিয়ে বসতি স্থাপন করে। এমতাবস্থায় হযরত আলী রা. তাদের উপর একজন শাসনকর্তা নিযুক্ত করে দেন। দীর্ঘ দিন পর্যন্ত তারা হযরত আলী রা. এর নিযুক্ত কর্মকর্তার শাসনাধীনেই ছিল। হযরত আলী রা. তাদের বিরুদ্ধে কোন সংঘর্ষে

যান নি। এ থেকে বোঝা যায়, বিদ্রোহীরা যতক্ষণ শাসকের আনুগত্য করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে না, যদিও তারা স্বতন্ত্র কোন এলাকায় বসবাস করতে শুরু করে।[১৭]

কিন্তু যদি এই বিদ্রোহীরা শাসকের আনুগত্য করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং রাষ্ট্রের অধিকার আদায় না করে যা তাদের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রকে দেয়া আবশ্যক, পক্ষান্তরে নিজেরা ভিন্ন শাসন প্রক্রিয়া চালাতে চেষ্টা করে, কর ইত্যাদি উসূল করতে শুরু করে, তাহলে তাদের অবস্থা দু'ধরনের হতে পারে ঃ

এক. হয়তো তারা নিজেদের কোন ইমাম বা শাসক মনোনীত না করেই এ কাজ করতে শুরু করেছে, দুই. নয়তো তাদের মধ্যে কাউকে ইমাম বা শাসক নিযুক্ত করে নিয়েছে। কোন ইমাম বা শাসক নিযুক্ত করা ছাড়াই যদি তারা ট্যাক্স কর ইত্যাদি আদায় করে থাকে তাহলে তারা যে সম্পদ ট্যাক্স কর ইত্যাদির নামে আদায় করেছিল তা লুণ্ঠিত সম্পদের পর্যায়ভুক্ত বিবেচিত হবে। যাদের কাছ থেকে তারা এসব সম্পদ আদায় করেছে সরকারি কোষাগারে তাদের দেয় পাওনা অপরিশোধিত বলেই গণ্য হবে। সেই সাথে বিদ্রোহীদের প্রতিষ্ঠিত সকল বিচারালয় ও বিচার ব্যবস্থা অস্তিত্বহীন অবৈধ বলে গণ্য হবে। তাদের এসব প্রশাসনিক তৎপরতার কিছুই সরকারের কাছে গৃহীত হবে না। কিন্তু বিদ্রোহীরা যদি কোন ইমাম বা শাসক নিযুক্ত করে তার নির্দেশে ট্যাক্স, খাজনা ইত্যাদি আদায় করে, তার অনুমোদন সাপেক্ষে আদালত কায়েম করে বিচার কার্য শুরু করে তাহলে সাধারণ নাগরিকরা তাদের যে ট্যাক্স, খাজনা দিয়েছে তা পুনর্বার আর সরকারী কোষাগারে দিতে হবে না, সরকার তাদের কাছে পুনর্বার এসব ট্যাক্স দাবী করতে পারবে না। এবং তাদের বিচার বিভাগ যেসব ফয়সালা দিয়েছে সেগুলো অস্তি ত্বহীন বিবেচিত হবে না। এতো গেলো প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যাপার কিন্তু বিদ্রোহীরা ইমাম মনোনীত করুক বা না করুক উভয় অবস্থাতেই এই বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে যতোদিন না ওরা প্রকৃত সত্য পথে ফিরে আসে।[১৮]

'মুঈনুল হুক্কাম' গ্রন্থে বলা হয়েছে, শাসকের কানে যখন বিদ্রোহীদের যুদ্ধ প্রস্তুতির সংবাদ পৌঁছে তখনই তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ অভিযান পরিচালনা করতে হবে। তাদের পাকড়াও করে বন্দী করতে হবে যাতে তারা তাদের তৎপরতা বাস্তবায়িত করতে না পারে। কেন না যে কোন মন্দ বিকশিত হওয়ার আগেই নিশ্চিহ্ন করে দেয়া সহজ। কিন্তু শাসকবর্গ যদি যথাসময়ে খবর না পান, আর বিদ্রোহীরা যুদ্ধ প্রস্তুতি নিয়ে নেয়, তাহলে ইমামের উচিত তাদেরকে হকের দিকে প্রত্যাবর্তন করার আহ্বান জানানো। তারা যদি ইমাম বা শাসকের প্রস্তাব মেনে নেয় ভালো নয় তো তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং তাদের পরাজিত করে বিভ্রান্তি নির্মূল করা শাসকের উপর ওয়াজিব।

অনুবাদ- শহীদুল ইসলাম

গ্রন্থপঞ্জি

১. নবীয : বলা হয় সিরকা জাতীয় জিনিসকে। আরবদের মধ্যে সিরকা খাওয়ার প্রচলন বেশি ছিল। তারা খেজুর পানিতে ভিজিয়ে রেখে সিরকা তৈরি করতো।

২. বেদায়াতুল মুজতাহিদ, ইবনে রুশদ খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৮২ এবং আহকামুল কুরআন আল জাসসাস খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩২৪

৩. এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন মুঈনুল হুক্কাম পৃষ্ঠা-১৭৯-১৮০, বেদায়াতুল মুজতাহিদ, ইবনে রুশদ খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৮২ এবং বেদায়েতুল মুজতাহিদ খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৭০-৩৭১, আল আহকামুস সুলতানিয়া, আলমাওয়ার্দী পৃষ্ঠা-২১৫, আহকামুস সুলতানিয়া আবু ইয়া'লা পৃষ্ঠা-২৫২, আহকামুল কুরআন লিল জাসসাস খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩২৪, নাইলুল আওতার আশ্‌শাওকানী খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৫০।

৪. মুঈনুল হুক্কাম পৃষ্ঠা-১৭৯-১৮০, বেদায়াতুল মুজতাহিদ, ইবনে রুশদ খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩১৭। তাবসারাতুল হুক্কাম, ইবনে ফারহুন ফুটনোট ফাতাহুল আলী আল মালেক খণ্ড-২, পৃষ্ঠা ৭৬৬ প্রথম প্রকাশ, মাতবায়ে আমীরিয়া, বুলাক, মিসর ১৩০০ সন। আল আহকামুস সুলতানিয়া আল মাওয়ার্দী পৃষ্ঠা-২৫৩, নাইলুল আওতার শওকানী খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-১৯।

৫. বর্তমান আইনের দৃষ্টিতে সেটি ছিলো Act of Parliamant (অনুবাদক)

৬. মুঈনুল হুক্কাম পৃষ্ঠা-১৮৬, আল আহকামুস সুলতানিয়া আল মাওয়ারদী পৃষ্ঠা-৫১-৫২, আল মুগনী ইবনে কোদামা খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-৭৪।

৭. বেদায়াতুল মুজতাহিদ, ইবনে রুশদ খণ্ড ২, পৃষ্ঠা-৩৮৩, আল মুগনী ইবনে কোদামা খণ্ড-১ পৃষ্ঠা-৭৪, আহকামুল কুরআন, আবু বকর আল জাসসাস খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৮৬, নাইলুল আওতার, শাওকানী খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৯৮-১০০।

৮. বেদায়াতুল মুজতাহিদ, ইবনে রুশদ খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৮ আল মুগনী, ইবনে কোদামা খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-৭৪ আহকামুস সুলতানিয়া, আল-মাওয়ারদী পৃষ্ঠা-৫২।

৯. আল আহকামুস সুলতানিয়া, আলমাওয়ারদী পৃষ্ঠা-৫২।

১০. আল আহকামুস সুলতানিয়া, আল মাওয়ার্দী পৃষ্ঠা-৫২।

১১. মুঈনুল হুক্কাম পৃষ্ঠা-১৮৬, বেদায়াতুল মুজতাহিদ, ইবনে রুশদ খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৮৩, আহকামুস সুলতানিয়া, আলমাওয়ারদী পৃষ্ঠা-৫২, আল মুগনী, ইবনে কোদামা খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৭৪-৭৫।

১২. আল আহকামুস সুলতানিয়া, আবু ইয়া'লা পৃষ্ঠা-৩৮, আশ শরহুল কবীর খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৯, আততাশরীউল জিনাই আল ইসলামী মা কাদাত বিল কানূনিল ওয়াদঈ; আবদুল কাদের আওদা, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১০।

১৩. সূরা হুজুরাত আয়াত ৯। এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূল স. এর সময় দু'দল মুসলমানের মধ্যে বিবাদ বাধে। বিবাদে পারস্পরিক সংঘর্ষ হলো। একদল অপর দলের বিরুদ্ধে হাতা পা ও জুতা পর্যন্ত ব্যবহার

করে। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করেন। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, দুই সাহাবীর মধ্যে লেনদেনের বিষয় নিয়ে ঝগড়া হলে তাদের একজন বললো, আমি তোমাদের কাছ থেকে আমার পাওনা আদায় করবোই করবো, এই সাহাবীর খান্দান ছিল শক্তিশালী। অপরজন বললো, তোমার আমার মধ্যে সৃষ্ট বিরোধ আল্লাহর রসূল স. মীমাংসা করে দেবেন, চলো তাঁর কাছে যাই। কেউ কেউ বলেন, বিবদমান দু'দল আসলে ছিল আউস ও খাযরাজ। তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিরোধে লাঠি পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়েছিল।

আবু বকর আল জাসসাস র. বলেন, এ আয়াতের বাহ্যিক অর্থে বোঝা যায়, প্রকৃতপক্ষে বিদ্রোহী জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত লড়াই করতে হবে যতক্ষণ না তারা আল্লাহর পথে ফিরে আসে। ব্যাপক অর্থে প্রত্যেক ঝগড়া বিবাদ ও লড়াইয়ের প্রশ্নেই এ নির্দেশ প্রযোজ্য বলে মনে হতে পারে কিন্তু এ রকম মনে করা ভুল। আহকামুল কুরআন, জাসসাস খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা ৩৭৭।

১৪. আহকামুল কুরআন, জাসসাস খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪৯১

১৫. আল আহকামুস সুলতানিয়া, আলমাওয়ারদী, পৃষ্ঠা-৫৬, আহকামুস সুলতানিয়া আবু ইয়ালা পৃষ্ঠা-৩৮, আবু ইয়া'লা লিখেছেন, একবার খারেজীদের একটি দল হযরত আলী রা. এর বিরোধিতা করল। একদিন হযরত আলী রা. যখন খুতবা দিচ্ছিলেন তখন এদের একজন শ্লোগান দিল, 'লা হুকমু ইল্লা লিল্লাহ' -আল্লাহ ছাড়া আর কারো হুকুম চলবে না'। এতে আলী রা. বললেন, তোমার কথা যথার্থ কিন্তু তুমি এর ভুল অর্থ গ্রহণ করছো। তোমাদের ব্যাপারে আমরা তিনটি বিষয় মেনে চলবো,

এক. মসজিদে এসে আল্লাহর ইবাদত করার পথে আমরা তোমাদের বাধা দেবো না। দুই. আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সূচনা করবো না। তিন. যত দিন তোমরা আমাদের প্রশাসনিক আইন মেনে চলবে ততদিন যুদ্ধলব্ধ সম্পদে তোমাদের অংশ দিতে অস্বীকৃতি জানাবো না।'

১৬. আহকামুস সুলতানিয়া আল মাওয়ারদী পৃষ্ঠা-৫৬, আহকামুস সুলতানিয়া আবু ইয়ালা, পৃষ্ঠা-৩৮-৩৯

১৭. আল আহকামুস সুলতানিয়া আবু ইয়ালা, পৃষ্ঠা-৩৯

১৮. আহকামুস সুলতানিয়া আল মাওয়ার্দী পৃষ্ঠা-৫৬, আবু ইয়ালা ৩৯: মুঈনুল হুক্কাম পৃষ্ঠা-৮৫

মেয়েদের বিশের আগে বিয়ে নয় আমরা কোন দিকে এগোচ্ছি

হাফেজা আসমা খাতুন

খবরের কাগজে দেখলাম, 'মেয়েদের-২০ এর আগে বিয়ে নয়' এমন একটি কর্মসূচি বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় হাতে নিয়েছে।

মেরী স্টোপস ক্লিনিক, পায়াকট, পরিবার পরিকল্পনা সমিতিসহ বিভিন্ন এনজিও 'বিলম্বে বিয়ে'কে উৎসাহিত করার জন্য পুস্তক, পোস্টার, লিফলেট প্রদর্শনী ও মালটিমিডিয়ায় অনুষ্ঠান প্রচার করেছে।

খবর পড়ে মনে হলো, বাংলাদেশ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের একটা কিছু করা দরকার, এজন্যেই দাতাদেশ এবং এনজিওদের পরামর্শে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় '২০-এর আগে বিয়ে নয়' এমন একটি কর্মসূচি হাতে নিয়েছে।

অথচ বাংলাদেশে মেয়ে বিয়ে দেয়া, ধনী-দরিদ্র্য সবার জন্য, বিশেষ করে দরিদ্র বাবা-মার জন্য এক বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যৌতুকের কারণে। এরপর যদি আবার '২০-এর আগে বিয়ে নয়' কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়, আর দরিদ্র পিতা-মাতা ২০-এর পরে মেয়ে বিয়ে দিতে না পারে, তখন এ অবিবাহিত মেয়েদের নিরাপত্তা এবং দায়িত্বের বোঝা দরিদ্র পিতা-মাতা কতদিন বহন করবে, তাদের ভরণ-পোষণের খরচ এবং নিরাপত্তার দায়িত্ব স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বহন করবে কি না সে সম্পর্কে কিছুই বলা হয় নি।

এ খবরের পাশাপাশি ইউরো বাংলার একটি সংখ্যায় আর একটি লেখা পড়লাম, 'ভাবনার বিষয়' কলামে। লেখিকার লেখার বিষয় ছিল 'বৈধ বিয়ে' বনাম 'অবৈধ সহাবস্থান'। লেখিকা আমেরিকা থেকে লিখেছেন, 'জারজ সন্তানে ভরপুর উন্মুক্ত এ সমাজ ব্যবস্থার নিষ্পাপ শিশুগুলো আজ অবাঞ্ছিত, অবহেলিত, পরিচয়হীন। পিতৃ পরিচয় প্রকাশে মা অপারগ। ১৪/১৫ বছরের কিশোর-কিশোরী থেকে উর্ধ বয়সী পর্যন্ত সবাই একই ব্যাধিতে আক্রান্ত। যার ফলে এইডসের ভয়াবহতা মারাত্মক রূপ ধারণ করেছে, ছড়িয়ে পড়েছে পশ্চিম থেকে পূর্বাঞ্চলে।'

তিনি লিখেছেন, 'কিশোর-কিশোরীদের অবৈধ সন্তান উৎপাদনের মাত্রা সবচেয়ে মারাত্মক। এখানকার টিভি চ্যানেলে এমন কিছু কুমারী মাতাকে প্রদর্শন করা হয়, যাদের সন্তান পিতৃ পরিচয়হীন। দুঃখের বিষয়, এ সমস্ত কুমারী মাতা সর্বসমক্ষে যাদের পিতৃ পরিচয় দাবি করে তারা সকলেই তা অস্বীকার করে। রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে তাদের পিতৃ

লেখক : প্রাবন্ধিক ইসলামী চিন্তাবিদ, সদস্য জাতীয় পরিষদ।

পরিচয় উদ্ধারের চেষ্টা করা হয়। রক্ত পরীক্ষায় সন্তানের সাথে যাদের সম্পর্ক প্রমাণিত হয়, তারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও আইনের মাধ্যমে সন্তান গ্রহণে বাধ্য হয়। রক্ত পরীক্ষায় যেগুলো প্রমাণিত হয়নি, সেই কুমারী মাতাদের আহাজারী এবং ক্রন্দনের দৃশ্য দেখে লেখিকা সেদিন ক্রন্দন সংবরণ করতে পারেনি। তিনি লিখেছেন, মেয়েগুলো মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদছে, 'ও মাই গড, ও মাই গড' বলে। এদের দ্বারা আজকের সমাজ কলুষিত। তিনি লিখেছেন, 'এসব জারজ সন্তানের লালন-পালনের দায়িত্ব কে বহন করবে ? যেহেতু এসব কুমারী মাতা নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কেই অচেতন অজ্ঞ। এদের কিভাবে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে ? কেন না তারা সকলেই ১৮ বছরের নিম্ন বয়সী।' খবর : সাপ্তাহিক ইউরো বাংলা, লন্ডন ৭-১৩ মে সংখ্যা ২০০২।

এ হচ্ছে পাশ্চাত্যের সবচেয়ে শক্তিধর, উন্নত এবং সভ্যতার গর্বে গর্বিত আমেরিকার সমাজের করুণ চিত্র। সে দেশে কিশোর-কিশোরীর অবৈধ সন্তান উৎপাদনের মাত্রা সবচেয়ে ভয়াবহ।

আমার প্রশ্ন, একটি উন্নত সভ্য প্রাচুর্যময় দেশের পারিবারিক ও সামাজিক চিত্র যেখানে এতো ভয়াবহ, যেখানে ছেলে-মেয়েদের অবাধ মেলামেশার ফলে কিশোর-কিশোরীদের সন্তান উৎপাদন তারা রোধ করতে পারছে না, যে দেশে প্রতিটি কুমারী মাতার বয়স ১৮ বছরের নীচে এ মারাত্মক অবস্থার কোনো পরিবর্তন, এতবড় প্রাচুর্যশালী, বিজ্ঞানে প্রযুক্তিতে যারা সর্বাধিক উন্নত হওয়া সত্ত্বেও আমেরিকা তার সমাধান খুঁজে পাচ্ছে না, সেখানে আমাদের দেশের মতো একটি অনুন্নত, দারিদ্র্য বেকারত্ব এবং নানান সমস্যায় জর্জরিত দেশের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কাদের পরামর্শে এ কর্মসূচী হাতে নিয়েছে যে, '২০-এর আগে মেয়েদের বিয়ে নয় ?' তারা কি কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে বাংলাদেশে কুমারী মাতা এবং জারজ সন্তানের সংখ্যা বাড়াতে চান ? তারা কি পাশ্চাত্যের মতো পারিবারিক ব্যবস্থা ধ্বংস করে 'কুমারী মাতা' 'জারজ সন্তান' এবং মরন ব্যাধি 'এইডসের' বিস্তার ঘটাতে চান ?

যাদের পরামর্শে এবং অতি উৎসাহে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এ কর্মসূচী হাতে নিয়েছে, তাদেরকে প্রশ্ন করা উচিত, তোমাদের দেশে তো মেয়েদের বিয়েই হচ্ছে না। তাতে তোমাদের দেশে কিশোরী মেয়েদের সন্তান উৎপাদনের মাত্রা এতো অধিক কেন ? তোমাদের দেশে সব কুমারী মায়েদের বয়স যেখানে ১৮'র নীচে সেখানে আমরা কিভাবে আমাদের দেশে 'মেয়েদের ২০-এর আগে বিয়ে নয়' কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে পারি?

বৃটেনে কুমারী মাতা এবং জারজ সন্তানের পেছনে সরকারকে বিরাট অংকের টাকা খরচ করতে হয়। আমাদের দেশের মতো দরিদ্র দেশে '২০-এর আগে মেয়েদের বিয়ে নয়' কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হলে, যদি কুমারী মাতা এবং জারজ সন্তানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে, তখন আমাদের বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এসব কুমারী মাতা এবং জারজ সন্তানের বোঝা বহন করতে পারবে কি ? এ দেশে অধিকাংশ বৈধ সন্তানের পিতা-মাতারাই দরিদ্র সীমার নীচে বসবাস করে।

আমাদের বাংলাদেশের মেজরিটি জনগণ মুসলমান। ইসলামের অনুশাসন মেনে চলার কারণে বিয়ের মাধ্যমে ছেলে মেয়েদের মেলামেশার ফলে আমাদের দেশে একটি দরিদ্র, অসহায় মেয়ের সন্তানেরও পিতৃ পরিচয় আছে। পিতৃ পরিচয়ের জন্য আইনের আশ্রয় নিতে হয় না বা আমাদের মুসলিম বাংলাদেশের দরিদ্র মেয়েদের কাউকে সন্তানের পিতৃ পরিচয়ের জন্য হাহাকার করে ক্রন্দনের রোল তুলতে হয় না। কোনো দরিদ্র পিতাও তার পিতৃত্ব অস্বীকার করে না। আমাদের সরকারের এসব দরিদ্র সন্তানের ভরণ-পোষণের ব্যয়ভার বহন করতে হয় না। দরিদ্র পিতা-মাতা সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে তাদের সন্তানের ভরণ-পোষণ করে। অবশ্য এনজিওদের খপ্পরে পড়ে যেসব গ্রামীণ মেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে চাকরির লোভে তাদের বিয়ে সমস্যা দেখা দিচ্ছে, কারো কারো জারজ সন্তান জন্ম নিচ্ছে।

পাশ্চাত্য যেখান ১৩/১৪ বছরের কুমারী মাতাদের জারজ সন্তানের জন্ম রোধ করতে পারছে না, কিশোরী মেয়েরা, ১৮ বছরের নিম্ন বয়সী মেয়েরা জারজ সন্তান জন্ম দিচ্ছে, সেখানে আমরা '২০-এর আগে বিয়ে নয়' কর্মসূচী বাস্তবায়নের বিরোধিতা করছি এবং এ কর্মসূচী বাতিল করার আহ্বান জানাচ্ছি। অন্যথায় এর প্রতিবাদে সচেতন দেশবাসীকে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানাচ্ছি। এদেশে কতিপয় এনজিও কার্যকলাপের প্রতি সরকারের নজর দেয়া উচিত। আমাদের দেশের জনগণ মেজরিটি মুসলমান। তাদের ধর্ম ইসলাম। ইসলাম এমন এক জীবন ব্যবস্থা যা পারিবারিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করেছে। মুসলিম সমাজে কুমারী মাতা এবং জারজ সন্তান জন্ম দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

এ ভয়াবহ কুমারী মাতা এবং জারজ সন্তানের জন্ম প্রতিরোধ করে মজবুত পারিবারিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে, মরণ ব্যাধি এইডসের বিস্তার রোধ করতে হলে পাশ্চাত্যকে ইসলাম ফোবিয়া থেকে মুক্ত হয়ে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিতে হবে, ইসলামের অনুশাসন মানতেই হবে। নইলে পাশ্চাত্যের মুক্তি নেই। আমরা সেই ভয়াবহ অবস্থা আমাদের সমাজে ডেকে আনতে চাই না।

বিয়ের ব্যাপারে আল্লাহ এবং রসূলের স. নির্দেশ :

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন, তাদের বিয়ে সম্পাদন করে দাও এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণ তাদেরও বিয়ে সম্পাদন করে দাও। তারা যদি নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ তাআলা নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে স্বচ্ছল করে দেবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। যারা বিবাহে সমর্থ নয়, তারা যেন সংযম অবলম্বন করে যে পর্যন্ত না আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেন।' (সূরা আন নূর ৩২-৩৩ আয়াত)

পবিত্র কুরআনের এ আয়াতে যারা বিয়ের উপযুক্ত হয় এবং বিয়ে হয়নি তাদেরকে বিয়ে দেয়ার জন্য অভিভাবকদের এবং দাস-দাসীর মনিবদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এখানে

কোনো বয়সের সীমা বেঁধে দেয়া হয়নি। যেসব পুরুষ বিবাহ করতে সমর্থ নয় অর্থাৎ স্ত্রীর ভরণ-পোষণ করার সামর্থ্য নেই, তাদেরকে সংযমী হতে বলেছেন। যে পর্যন্ত না আল্লাহ তাদের অভাবমুক্ত করে দেন।

এ আয়াত দু'টিতে আল্লাহ তাআলা অভিভাবকদের উপরে ছেলে-মেয়ের বিয়ের দায়িত্ব অর্পন করেছেন। ছেলেমেয়েদের নিজে নিজে বিয়ে করা ইসলামে পছন্দনীয় নয়। ইসলামী সমাজে এবং পরিবারে ছেলেমেয়েদের নিজেদের বিয়ের চিন্তা করতে হয় না। অভিভাবকরাই ছেলেমেয়ে উপযুক্ত হলেই বিয়ে দেয়ার চিন্তা-ভাবনা করেন এবং বিয়ের কাজ সম্পাদন করেন। পাশ্চাত্য সমাজ আল কুরআনের বিধান থেকে দূরে থাকার কারণে পিতা-মাতা জানেই না যে, ছেলেমেয়ের বিয়ে পিতা-মাতা বা নিকট আত্মীয়দের সম্পাদন করাই উত্তম। পাশ্চাত্যে ছেলে-মেয়েরা নিজেদের বিয়ে নিজেরা সম্পাদন করতে গিয়েই সমাজে জারজ সন্তানের বোঝা বাড়ছে।

আল্লাহর রসূল স. বলেছেন, 'তোমাদের ছেলে-মেয়ে সাবালক হলেই বিয়ে দাও।' বিবি আয়শা সাবালক হওয়ার পরই ১১ বছর বয়সে রসূল স. এর ঘরে আগমণ করেন। তিনি সুন্দর স্বাস্থ্যবতী ছিলেন। সর্বজ্ঞ আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে মানব জাতির জন্য যে বিধান দিয়েছেন তা সমগ্র মানব জাতির জন্যই কল্যাণকর প্রমাণিত হয়েছে।

দাতা দেশগুলো যেসব সমস্যায় জর্জরিত সেসব সমস্যা আমাদের বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশে যাতে না হয়, সেদিকে খেয়াল রেখে দাতা দেশের সঙ্গে চলতে হবে। জনগণের পারিবারিক এবং ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগে, এমন কোনো কর্মসূচি দাতা দেশের পরামর্শে হাতে নেয়া যাবে না। দাতা দেশকে বলতে হবে, এ কর্মসূচি হাতে নিলে আমরা সরকার চালাতে পারবো না। জনগণ ক্ষেপে যাবে।

এনজিওদের প্রতি সরকারের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে, তারা যেন জনগণের পারিবারিক এবং ধর্মীয় ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করে। সরকার যদি এনজিওদের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে সজাগ না থাকে এবং এনজিওগুলো মেজরিটি মুসলমানদের ধর্মীয় ও পারিবারিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে, তাহলে জনগণ এদের বিরুদ্ধে ক্ষেপে যাবে। তখন জনগণকে সরকারের সংযত রাখা কঠিন হবে। এর আগে এনজিওরা পতিতাদের নিয়ে মিছিল এবং সম্মেলন করেছিল যা জনগণকে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল। যা ইসলামে অশ্লীলতা এবং নগ্নতার প্রচারের মতো জঘন্য অপরাধের শামিল। এনজিওরা দারিদ্র্য বিমোচনের কাজের বাইরে অন্য কোনো কাজে হস্তক্ষেপ করবে না। আমরা জানি পতিতাদের কিভাবে সম্মানজনক পুনর্বাসন করতে হয়। ইসলাম আমাদের সে শিক্ষা দিয়েছে। আমাদের ছেলেমেয়েদের কোন বয়সে বিয়ে দিতে হবে, ইসলাম আমাদের সে শিক্ষা দিয়েছে। এ নিয়ে আমাদের কোনো সমস্যা নেই। আমাদের হচ্ছে আর্থিক সমস্যা। আমাদের দেশের দরিদ্র মেয়েদের বিয়ে দেয়ার জন্য দাতা দেশ সাহায্য করতে পারে। তারা দেখতে পারে, আমরা কিভাবে পতিতাদের সম্মানজনকভাবে পুনর্বাসন করি। ইরানে ইসলামী সরকার হওয়ার পর ইরানের শাহের আমলের হাজার হাজার পতিতাদের

ইরানের মুসলিম যুবকেরা ইমাম খোমেনীর নির্দেশে বিয়ে করে ঘরে তুলে নিয়েছে। আজ তারা ইসলামী পরিবারে সম্মানিতা গৃহিনী, সম্মানিতা সন্তানের মাতা। ইমাম খোমেনী বলেছিলেন, 'আমি যদি আজ যুবক থাকতাম তাহলে আমি পতিতা মেয়ে বিয়ে করে ঘরে তুলে নিতাম।' তার এ বাণী শুনে সমস্ত মুসলিম যুবকেরা ইরানের হাজার হাজার পতিতা মেয়েদের বিয়ে করে সসম্মানে ঘরে তুলে নিয়েছে। আজ ইসলামিক ইরানে কোনো পতিতা সমস্যা নেই। আল-কুরআনের পর্দার নির্দেশ মেনে চলার কারণে ইসলামিক ইরানে পর্দা রক্ষা করে মেয়েরা জাতীয় সমস্ত কর্মকাণ্ডে অংশ নিচ্ছে। ইসলামিক ইরানের পারিবারিক এবং সামাজিক ব্যবস্থা থেকে পাশ্চাত্য নেতারা শিক্ষা নিতে পারেন।

আফগানিস্তানেও তালেবান ইসলামিক সরকার হওয়ার পর সে দেশে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই সব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। নারী নির্যাতনের কোনো ঘটনা আফগানিস্তানে তালেবান সরকারের আমলে শোনা যায় নি।

বাংলাদেশের মেয়েদের বিয়ের বয়স দাতা দেশের বা এনজিওদের নির্ধারণ করে দিতে হবে না। কারণ তাদের দেশেই তারা মেয়েদের বিয়ে দিতে পারছে না। তাদের দেশেই কুমারী মাতা এবং জারজ সন্তানের সমস্যা তারা সমাধান করতে পারছে না। ইসলামে সব সমস্যার সমাধান রয়েছে। দাতা দেশের প্রতিনিধিরা আমাদের অর্থ দিয়ে সাহায্য করুন। তারা দেখুন আমরা কিভাবে ইসলামের আলোকে দারিদ্র্য, বেকারত্ব, পতিতা সমস্যা, মেয়েদের বিয়ে সমস্যার সমাধান করি। তখন দাতা দেশ ইসলামের আলোকে তাদের দেশের যাবতীয় সমস্যার সমাধান খুঁজে পাবেন এবং তা দূর করতে পারবেন।

সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব হচ্ছে, জনগণের কাছে স্বাস্থ্য সেবা পৌছে দেয়া, দরিদ্র জনগণের ফ্রি চিকিৎসার ব্যবস্থা করা,গর্ভবতী মা ও সন্তানের স্বাস্থ্যসেবা ও সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা, হাসপাতালে বেডের সংখ্যা বৃদ্ধি করা, চিকিৎসা সরঞ্জাম সহজলভ্য করা, হাসপাতালের ডাক্তার, নার্সদের উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা দান করা এবং তাদের উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করা। গ্রাম-গঞ্জে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করে গ্রামের দরিদ্র প্রসূতি মায়েদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এ কাজগুলো হাতে নিতে পারেন এবং তাতে জনগণের আস্থা বৃদ্ধি পাবে। তাতে জনগণ উপকৃত হবে সরকারও লাভবান হবেন।

প্রচলিত বাইয়ে-মুআজ্জালের রূপরেখা ও ইসলামী আইন

মুফতী সাইয়্যেদ সাইয়াহ্ উদ্দীন

ইসলামী আইনে বাইয়ে মুআজ্জাল হলো ক্রেতা ও বিক্রেতার পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে সম্পাদিত চুক্তি, যাতে পণ্য নগদ প্রদান করা হয় এবং নির্ধারিত মূল্য বিলম্বে পরিশোধ করা হয়। তবে বিলম্বে পরিশোধিত মূল্য প্রচলিত বাজার দর অপেক্ষা বেশি হওয়া জরুরী নয়। আর বাইয়ে মুরাবাহা বলে এমন লেনদেনকে যে লেনদেনে বিক্রেতা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয় যে, এ দ্রব্য আমি এত মূল্যে ক্রয় করেছি কিংবা এর পিছনে আমার এত টাকা ব্যয় হয়েছে, এখন আমি এ পরিমাণ লাভসহ বিক্রি করতে ইচ্ছুক। অত:পর ক্রেতা এ কথায় বিশ্বাস করে প্রস্তাবিত মূল্য দিয়ে পণ্যটি খরীদ করে এ ক্ষেত্রেও পণ্যমূল্য বাজার মূল্যের বেশি হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।।

ধরা যাক, একটি পণ্যের প্রচলিত বাজার মূল্য পাঁচ হাজার টাকা। এ মুহূর্তে ক্রেতার নিকট সে টাকা নগদ থাকলে সে অনায়াসে পণ্যটি কিনতে সক্ষম হতো। কিন্তু যদি নগদ টাকা না থাকে তাহলে সে ঋণ নেয়ার জন্য ব্যাংকে গেলো। আর ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তখন শতকরা বিশ টাকা হারে সূদের ভিত্তিতে তাকে ঋণ প্রদানে সম্মত হলো। ফলে বছরান্তে সূদে আসলে মোট ছয় হাজার টাকা ব্যাংকে প্রদান করে তাকে দায়মুক্ত হতে হবে। সুতরাং সূদ থেকে বাঁচার জন্য সে ব্যাংকে না গিয়ে যদি সরাসরি বিক্রেতাকে বলে, 'পণ্যটি আমার কাছে বাকীতে বিক্রি করো।' উত্তরে বিক্রেতা বললো, মূল্য নগদ আদায় করলে এর দাম পাঁচ হাজার টাকা, আর বাকী পরিশোধ করলে ছয় হাজার টাকা। অত:পর ক্রেতা ছয় হাজার টাকায় বাকী মূল্যে পণ্যটি কিনে নিলো। উল্লিখিত এই লেনদেনই ইসলামী ব্যাংকিং সেক্টরে বাইয়ে-মুআজ্জাল হিসেবে প্রচলিত। এ ক্ষেত্রে বিলম্বে মূল্য পরিশোধের অজুহাতে বাজার মূল্যের অতিরিক্ত টাকা দিয়ে মাল কিনতে ক্রেতাকে বাধ্য করা হয়। শরীয়তের দৃষ্টিতে এই বাইয়ে-মুআজ্জাল বৈধ না অবৈধ এটি বির্চা বিষয় ।

ফকীহ্ ও মুফাসসিরগণের প্রণীত সূদের সংগার আলোকে আপাত দৃষ্টিতে বলা যায়, বাইয়ে-মুআজ্জাল সরাসরি সূদ নয়, বিধায় তা নিষিদ্ধ নয়। তবে গভীরভাবে চিন্তা করলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায় যে, সূদী কারবারে যেমন অর্থের পাহাড় গড়ার অশুভ প্রবণতা সক্রিয় থাকে, তেমনি এ ক্ষেত্রেও তা পুরোপুরি বিদ্যমান। বস্তুত এটি একটি অপকৌশল, যাকে দরিদ্র অসহায় ভোক্তাদের কষ্টার্জিত অর্থ শোষণ করার জন্য এক অভিনব হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সংগত কারণেই ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে তাই বাইয়ে-

---

লেখক : পাকিস্তানের বিশিষ্ট গবেষক আলেম ও গ্রন্থকার।

মুআজ্জাল মাকরূহ বা অবৈধ বলে বিবেচিত হবে। কেন না লেনদেন ও কায়কারবারে যদি এর বৈধতার স্বীকৃতি দেয়া হয় এবং বাজারে-এর অবাধ প্রচলন শুরু হয়ে যায় তাহলে এর বিষক্রিয়ায় সুষম ও ভারসাম্যপূর্ণ অর্থ ব্যবস্থার ভিত দুর্বল হয়ে পড়বে এবং পুঁজিবাদের অশুভ তৎপরতায় সমাজে শোষণের ভয়াল চিত্র ফুটে উঠবে। এভাবে যাবতীয় অর্থনৈতিক অনাচার সক্রিয় হয়ে উঠবে। যেমনটি হয়ে থাকে সূদের প্রভাবে।

আমরা দেখতে পাই, প্রকৃত সূদ থেকে যেন মানুষ বাঁচতে পারে সে জন্য শরীয়ত যে সকল লেনদেন মানুষের মনকে সূদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে এবং সূদখোরী ও পুঁজিবাদী মনোভাব এবং বস্তুবাদী চিন্তায় মানুষকে প্ররোচিত করে সেগুলোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। হাদীসে 'রিবা আল ফদল' পারস্পরিক নগদ লেনদেনে কোন এক পক্ষের অতিরিক্ত গ্রহণ করা বা দেয়াকে মূলত এ উদ্দেশ্যেই হারাম করা হয়েছে। একই উদ্দেশ্যে স্বর্ণের অলংকার ও স্বর্ণের টুকরোর মধ্যে বিনিময় হলে উভয়টিতে পরিমাণগত সমতা রক্ষা করার বিধান দেয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে স্বর্ণের সাথে বিনিময়ের সময় অলংকার তৈরির মজুরী বাবদ কিছু অতিরিক্ত গ্রহণ করার অনুমতি শরীয়ত দেয়নি।

অনুরূপভাবে একই জাতীয় দ্রব্যের উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্টের মাঝে বিনিময় হলে সে ক্ষেত্রেও পরিমাণ সমান সমান হতে হবে। উৎকৃষ্টের গুণ ও মান উন্নত হওয়ায় এর বদলায় নিকৃষ্টের পরিমাণ বেশি নেয়া বৈধ হবে না। হাদীসে কোন পণ্যকে তার প্রকৃত মূল্যের অতিরিক্ত দামে বাকী বিক্রি করা এবং পণ্য বিক্রয়ের পর তার মূল্য উসূল করার পূর্বে একই পণ্য অপেক্ষাকৃত কম দামে ক্রয় করাকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেন না এগুলো পারিভাষিক অর্থে সূদ না হলেও কার্যত সূদের মতই অর্থনৈতিক শোষণের এক মোক্ষম কৌশল ও হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মুহাকালাহ্ তথা শস্যের বিনিময়ে ক্ষেতের অপরিপক্ক ফসল বিক্রি করা এবং মুজাবানাহ তথা ঘরে রক্ষিত ফলের বিনিময়ে গাছের অপরিপক্ক ফল বিক্রি করাকেও অবৈধ বলা হয়েছে। কেন না এ ক্ষেত্রে গাছের ফল ও ক্ষেতের ফসলের পরিমাণ সঠিকভাবে নিরূপণ করা সম্ভব নয়, বরং অনুমান করে লেনদেন করতে হয়, আর তখন উভয় দিকে কম-বেশি হওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা থাকে তাই তা নিষিদ্ধ। মওজুদদারী ও গুদামজাত করাকেও একই কারণে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং যারা এ কাজ করে তাদের উপর অভিশম্পাত করা হয়েছে। কেননা এই দু'টি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাজারে কৃত্রিমভাবে পণ্যের চাহিদা ও উপযোগ সৃষ্টি করা হয়। মানুষ তখন চড়া দামে পণ্য সামগ্রী কিনতে বাধ্য হয়। আর তাদের এই অভাবের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী অধিক মুনাফা আহরণে উন্মত্ত হয়ে পড়ে।

নগদ ও বাকিতে ক্রয় বিক্রয় ও লেনদেন সম্পর্কে শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি কী পাঠকবৃন্দ তা সহজেই উপলব্ধি করেছেন। সেই সাথে তাদের কাছে এও স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, মূল্য বাকীতে পরিশোধের সুবাদে চড়া মূল্যে পণ্য বিক্রি করা শরীয়ত পরিপন্থী এবং মানবতা বিরোধী কাজ। সুতরাং অর্থনৈতিক অনিষ্টতা থেকে সমাজকে মুক্ত করতে সূদকে যেমন সাংবিধানিকভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা এবং প্রশাসনিকভাবে সে আইন বাস্তবায়ন করা আবশ্যক, তেমনি সূদের সম্ভাব্য সমস্ত পথ রুদ্ধ করতে উল্লিখিত সকল অনৈতিক ও

ক্ষতিকারক লেনদেন অবৈধ ঘোষণা এবং তা উৎখাত করা প্রয়োজন। অন্যথায় সূদী ব্যবসায়ীরা সূদের পরিচিত পদ্ধতি পরিহার করে এই নব সৃষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করবে এবং দরিদ্র ও অসহায়দের অর্থ শোষণ করার বৈধ সনদ পেয়ে যাবে। কেন না বাইয়ে-মুআজ্জালের নামে যে অতিরিক্ত মূল্য ধার্য করা হয় তার প্রভাব ও ক্রিয়া শেষাবধি সাধারণ ভোক্তাদের উপর গড়ায়। বস্তুত বাইয়ে মুআজ্জালকে বৈধতার সনদ দেয়া হলে কমার্শিয়াল ইন্টারেস্ট বা বাণিজ্যিক সূদকে হারাম বলার কোনো যুক্তি থাকে না। কেন না যে অর্থনৈতিক শোষণ ও নির্যাতন বন্ধ করার জন্য সূদকে হারাম করা হয়েছে সেটাই বাইয়ে-মুআজ্জালে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। যেমন সূদে ঋণ গ্রহণ করে যারা ব্যবসা বাণিজ্য করছেন বা মিল কারখানা গড়ে তুলছেন তারা বছরান্তে ১৫% হারে অর্থ যোগান দাতা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সূদ প্রদান করেও বছরে কোটি কোটি টাকা মুনাফা কামাচ্ছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও শরীয়ত একে শোষণ গণ্য করে প্রকৃত সূদ আখ্যা দিয়েছে এবং সর্বতোভাবে তা নিষিদ্ধ করেছে। এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে যথেষ্ট দলীল প্রমাণ রয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম দলীল হল, এই ব্যবসায়ী ১৫% থেকে ২০% হারে যে সূদ ব্যাংককে দিচ্ছে তা সাধারণ ভোক্তাদের থেকে তিলে তিলে শোষণ করেই প্রদান করছে। কেন না কারখানার উৎপাদিত পণ্য যখন বাজারজাত করে তখন পণ্যের গায়ে যে দাম ধার্য হয় তা উৎপাদন খরচ অনুসারে হয়। উৎপাদন খরচের মধ্যে কাঁচামালের দাম, শ্রমিকের বেতন, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানির বিল এবং অন্যান্য খরচাদির সাথে ব্যাংককে প্রদত্ত সূদও যোগ করা হয়। ফলে ভোক্তাশ্রেণীকে এসব উচ্চ ব্যয় পরিশোধ করে অপেক্ষাকৃত বেশি মূল্যে পণ্য কিনতে হয়। অথচ সূদ হিসেবে প্রদত্ত টাকা জনগণের সমষ্টিগত কোন কল্যাণে ব্যয়িত হবে না, বরং ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ও মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি উদ্যোক্তারা নিজেদের অর্থের পাহাড় গড়ার জন্য এ অর্থকে সিঁড়ি বানায়।

কোন কোন ফকীহ্ অবশ্য এই প্রচলিত বাইয়ে-মুআজ্জালকে বৈধ বলেছেন। কিন্তু এ বৈধতারও ব্যাখ্যা রয়েছে তা হলো, দুই ব্যক্তির মধ্যে বাইয়ে-মুআজ্জাল অনুষ্ঠিত হওয়ার পর মূল্য পরিশোধ করার নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হয়েছে। তখন ক্রেতা যদি ক্রয়কৃত পণ্যের শুধু বাজার দাম পরিশোধ করে এবং অতিরিক্ত মূল্য প্রদান করতে সম্মত না হয় এ জন্য বিক্রেতা বাদী হয়ে আদালতে মামলা দায়ের করে তখন বিচারক ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে বিক্রেতার পক্ষে রায় দিবেন এবং ক্রেতার উপর অতিরিক্ত মূল্য প্রদানকে বাধ্যতামূলক করবেন। সুতরাং বাহ্যিক সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে ধার্যকৃত পুরো মূল্য বিক্রেতার প্রাপ্য বলে বিচারকের রায় প্রদানই হল বাইয়ে-মুআজ্জালের বৈধ হওয়ার অর্থ।

তবে দীনী অনুভূতি ও বিশ্বাস এবং ঈমানী চাহিদা ও দাবীর প্রেক্ষিতে এই লেনদেন কখনো বৈধ হতে পারে না। মূল কথা আইনগতভাবে বৈধ হলেও নীতিগতভাবে তা অবৈধ। মুআমালাত তথা লেনদেনের ক্ষেত্রে বেশ কতগুলো পদ্ধতি রয়েছে। সেগুলো নীতিগতভাবে বৈধ নয়, তা সত্ত্বেও আইনের দৃষ্টিতে সেগুলোর কার্যকারিতা বলবৎ থাকে। বাইয়ে-মুআজ্জাল এ শ্রেণীভুক্ত।

কেউ যদি কারো কাছ থেকে একশত টাকা ১০% সূদে ঋণ গ্রহণ করে এবং মেয়াদ

শেষে শুধু ঋণ বাবদ গ্রহীত মূলধন পরিশোধ করে আর মূলধনের অতিরিক্ত সূদ প্রদান করতে গড়িমসি করে তখন ঋণ দাতা তার বিরুদ্ধে বিচারকের শরণাপন্ন হলে বিচারক সূদ না দেয়ার পক্ষে রায় দিবেন।

বাণিজ্যিক সূদের মত বাইয়ে-মুআজ্জালের দ্বারাও মানুষ শোষিত ও নিগৃহীত হয়। কেন না কোন ব্যবসায়ী যখন বাকী মূল্যে মাল কিনে তা দোকানে উঠায় আর সে মূল্য (বিলম্বে পরিশোধ করার দায়ে) পণ্যের নির্দিষ্ট বাজার মূল্য অপেক্ষা বেশি হয়, তখন বাধ্য হয়েই ভোক্তাদের নিকট আরো উচ্চ মূল্যে তা বিক্রি করে।

সুতরাং বাইয়ে-মুআজ্জল যদি ব্যাপকভাবে চালু হয়ে যায় তাহলে বড় বড় পুঁজিপতিরা সূদের ভিত্তিতে ঋণ প্রদানের মত তাদের ব্যবসায় পণ্য সাধারণ মূল্য অপেক্ষা অধিক চড়া মূল্যে বাকী বিক্রি করা শুরু করবে। যার ফলশ্রুতিতে একদিকে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হবে যে, যারা বাকী বিক্রি করবে না তাদের কাছে কেউ পণ্যসামগ্রী নিতে যাবে না। যাতে স্বল্প পুঁজির ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা সর্বস্বান্ত হয়ে ব্যবসা থেকে হাতগুটিয়ে বসতে বাধ্য হবে। অন্য দিকে বাকী বিক্রির জের স্বরূপ ভোক্তাদের অর্থের বৃহদংশ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের হাত ঘুরে বড় পুঁজিপতি মহাজনদের পকেটে গিয়ে পড়বে। এভাবে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির হাতে সম্পদ কুক্ষিগত হয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেনদেনের প্রধান চালিকা শক্তি তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে এবং অর্থের স্বাভাবিক আবর্তন ব্যাহত হওয়ায় সম্পদ আদান প্রদান ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে জনগণের অবাধ অধিকার প্রয়োগ রুদ্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং লেনদেনে অতিরিক্ত প্রদানের পক্ষে বিচারকের রায় দেয়াতে এ দু'টি বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে গেছে। হতে পারে এ পার্থক্যের কারণে কেউ কেউ সূদের বিপরীতে একে বৈধ বলে অভিহিত করেছেন।

দ্বিতীয়ত বাইয়ে-মুআজ্জাল বৈধ বলার আরেকটি উদ্দেশ্য এও হতে পারে যে, কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে যুক্তিসংগত কারণে এবং একান্ত বাধ্যবাধকতার শিকার হয়ে কেউ প্রচলিত বাজার মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যে (যা বাকীতে পরিশোধযোগ্য) পণ্য বিক্রি করে তখন শুধু তার জন্য এ লেনদেন বৈধ হবে। এভাবে বিক্ষিপ্তভাবে সমাজের কোথাও কদাচিত এরূপ হয়ে গেলে তা সরাসরি সূদ না হওয়ার কারণে বৈধ হবে। কিন্তু যদি বাজারের সর্বত্র এর ব্যাপক প্রচলন ঘটে তাহলে এর সাথে জড়িতরা ব্যবসায়ী বলে গণ্য হবে না। কেননা এখানে লাভ ক্ষতির সম্ভাবনা অনুপস্থিত, বরং সূদের মত নিছক মুনাফা আহরণের লোভে বিক্রেতা উদ্বেল থাকে অহর্নিশ, অপর দিকে বিক্রেতার ক্ষতি বা লোকসানের ন্যূনতম সম্ভাবনা থাকে না ।

সমাজে মানুষের স্বাভাবিক জীবন পদ্ধতির ভারসাম্য ও স্থিতি অক্ষুণ্ন রাখার স্বার্থে এ জাতীয় শোষণমূলক ও ক্ষতিকারক লেনদেন প্রক্রিয়া পুরোপুরিভাবে পরিহার করা আবশ্যক। 'ইসলামী নযরিয়াতী কাউন্সিল ইসলামাবাদ' সূদের বিরুদ্ধে একটি সুবিন্যস্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। তাতে চড়া মূল্যের শর্তে নগদ মাল বিক্রি করাকে মাকরূহ বলা হয়েছে। তাতে আরো বলা হয়েছে, সূদ যা অকাট্য দলীল দ্বারা নিষিদ্ধ হয়েছে তা

থেকে বাঁচার জন্য যদি সাময়িকভাবে বাইয়ে-মুআজ্জাল অবলম্বন করা হয় তবে তা বৈধ হবে। কিন্তু শর্ত হলো তা একান্ত ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা চাই, তা দ্বারা রীতিমত মুশারাকাত বা অংশীদারী কারবার এবং মুদারাবাহ বা দ্বি-পাক্ষিক কারবার শুরু করলে তা বৈধ হবে না।

তবে বাস্তবে দেখা গেছে যে, এই সাময়িক বৈধতার বেড়াজালে একশ্রেণীর ব্যবসায়ী সূদমুক্ত লেনদেনের নামে ঐ কারবারেই তৎপর হয়ে উঠেছে। অনেক দীনদার ও পরহেযগার ব্যক্তিও অজ্ঞতাবশত সূদে জড়িয়ে পড়ছে। মূলত দীর্ঘ দুই শত বছর ইংরেজ বেনিয়া কর্তৃক পরিচালিত শাসন ব্যবস্থা আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও দীনী চেতনার মূলে কুঠারাঘাত হেনেছে। এই অপশাসনের ডানায় ভর করে ঔপনিবেশিক গোষ্ঠী মুসলমানদের সহজ সরল অনুভূতি ফলকে সযত্নে রক্ষিত দীনী বিশ্বাসের উপর মসিলেপন করে সেখানে বস্তুবাদী বিশ্বাসের কৃত্রিম ছক এঁকে দিয়েছে। অত:পর সে ছকের মায়া জালে আবদ্ধ মুসলমান শেষাবধি তাদের মানসপুত্র সেজেছে। তারাই আজ নানা ছলছুতায় সূদকে বৈধ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। সূদের সাথে তাদের দারুন সখ্যতা ও মিতালী পরিলক্ষিত হয়। ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষা পেয়ে তারা এতোটাই উজ্জীবিত হয়েছে যে, স্বভাবতই এখন আর তারা সূদকে ঘৃণার চোখে দেখে না। তাদের বড় একটা অংশ আধুনিক সূদী ব্যাংকগুলোতে প্রচলিত কমার্শিয়াল ইন্টারেস্টকে সূদ হিসেবে আখ্যা দিতে নারাজ। সে যাহোক, আমরা প্রকৃত সূদের পাশাপাশি বাইয়ে-মুআজ্জাল নামে যে পরোক্ষ সূদ গ্রহণ করা হয় তাও অবৈধ বলি। তা না হলে সাধারণ মানুষের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যাবে যে, শোষণ ও অসম অর্থব্যবস্থার বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে ইসলাম সূদকে হারাম করেছে, অথচ সে ইসলামেই বুঝি বাইয়ে-মুআজ্জালের নামে এক প্রতারণা ও ধোকার ব্যবসাকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে, যা অর্থনৈতিক শোষণ ও নিপীড়ণের ক্ষেত্রে সূদের চেয়েও ভয়ংকর। কেন না এখনো সমাজের অনেক মানুষ আন্তরিকভাবে সূদ থেকে বেচে থাকার চেষ্টা করে। কিন্তু যখন বাইয়ে-মুআজ্জালের ছদ্মাবরণে সূদের মতই শোষণ ও অর্থলিপ্সা চরিতার্থ হতে শুরু করবে, তখন এই লেনদেন শরীয়ত কর্তৃক অনুমোদন পেলে সাধারণ বিশিষ্ট নির্বিশেষে সকল মুসলমান এতে সানন্দে জড়িয়ে পড়বে এবং ব্যক্তিস্বার্থোদ্ধারে বেপরোয়া হয়ে উঠবে। ফলে গোটা দেশে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে এবং অশুভ পুঁজিবাদ বিস্তারের পথ সুগম হবে।

অনেকেই মনে করেন যে, কুরআন কাউকে ঋণ প্রদান করে অতিরিক্ত গ্রহণ করাকে সূদ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। কিন্তু যে সব ক্ষেত্রে পণ্যের বিনিময়ে পণ্য বা পণ্যের বিনিময়ে টাকার লেনদেন হয় সে ক্ষেত্রে কম-বেশি হলে অতিরিক্ত অংশ সূদ হয় না। কেন না তাতে সূদের সংগা প্রযোজ্য হয় না। বস্তুত তখন এটি সদিচ্ছার সাথে সম্পাদিত একটি চুক্তি যাতে মালের বিনিময়ে মাল আদান প্রদান করা হয়েছে। আর এ জাতীয় লেনদেনের নাম বেচাকেনা যাকে শরীয়ত সরাসরি হালাল ঘোষণা করেছে। এ ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য হলো, যে সকল বেচাকেনায় সরাসরি সূদ রয়েছে বা সূদের সাথে তার কোনো

ক্ষেত্রে মিল রয়েছে– যেমন তাতে সূদের মতই অতিরিক্ত অর্থ শোষণ করার মানসিকতা ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে এবং সূদ যেমন সমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্য ও স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করে তদস্থলে পুঁজিবাদী মনোভাব বৃদ্ধি করে তেমনি এই বেচাকেনায়ও একই প্রভাব বিস্তার করে চলে- সে সব লেনদেনকে শরীয়ত হারাম করেছে। পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, রিবা আল ফদল বা একই জাতীয় দ্রব্যের পারস্পরিক নগদ বিনিময় হলে এবং পাত্রের মাপে বা ওজনের মাপে এর পরিমাণ নির্ধারণ করা হলে সে ক্ষেত্রে কোন একজনের অতিরিক্ত গ্রহণ করা বা দেয়াকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে,'ওয়াল ফাদলু রিবা' তথা প্রদত্ত বা গ্রহীত অতিরিক্ত অংশ সূদ হিসেবে বিবেচিত হবে। অনুরূপভাবে উৎকৃষ্ট খেজুরের বদলে নিকৃষ্ট খেজুরের পরিমাণ বেশি নেয়াকে এবং মুহাকালা ও মজাবানাকে একই কারণে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অথচ এসবই বেচাকেনার অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে এ শর্তে একশত টাকা ঋণ হিসেবে প্রদান করল যে তাকে পরবর্তীতে ঋণ পরিশোধকালে একশত বিশ টাকা দিতে হবে। আর এ অতিরিক্ত বিশ টাকা হালাল করার জন্য এর ব্যাখ্যা করল এভাবে যে, আমি তাকে একশত টাকা ঋণ বাবদ প্রদান করি নি, বরং তার কাছে তা বিক্রি করেছি এবং তার বিনিময় ধার্য করেছি একশত বিশ টাকা যা বিলম্বে পরিশোধ যোগ্য। সুতরাং অতিরিক্ত বিশ টাকা সূদ নয় বরং তা বেচাকেনার মাধ্যমে লব্ধ মুনাফা যা সম্পূর্ণ হালাল। সার কথা হলো, যে সব ক্রয় বিক্রয়ে সূদভিত্তিক বণিকী মানসিকতা কাজ করে তা হালাল হতে পারে না। হালাল হতে পারে না সে সব লেনদেনও যা মূলত হারাম কিন্তু কথার মারপ্যাচে তাকে হালাল বানানোর চেষ্টা চালানো হয়েছে। এ সবই প্রতারণা ও ধোকা বৈ কিছু নয়। বাইয়ে-মুআজ্জালের যাবতীয় কর্মকাণ্ড- যা বর্তমানে প্রচলিত এ জাতীয় নীতিবহির্ভূত লেনদেনেরই অংশ বিশেষ।

অনুবাদ ঃ মুখলেসুর রহমান

ইসলামী আইনের বৈশিষ্ট

ড. মাওলানা মুশতাক আহমদ

আইনের আদি ও প্রধান উৎস কি এ বিষয়ে বিভিন্ন কথা পাওয়া গেলেও নির্ভরযোগ্য আইন গবেষকদের মতে অহী তথা আল্লাহর প্রত্যাদেশই হলো আইনের আদি ও প্রধান উৎস, মানুষের মস্তিষ্ক নয়। অহী যাকে আমরা ধর্ম হিসেবে অভিহিত করি মানুষকে আইন মেনে চলতে অভ্যস্ত করে। পৃথিবীর প্রথম মানব ছিলেন সাইয়িদুনা হযরত আদম আলাইহিস সালাম। তাঁকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান দান করে আল্লাহ তাআলা যখন পৃথিবীতে পাঠান তখন বলেছিলেন, 'আমি বললাম, তোমরা সকলে এ স্থান থেকে নেমে যাও। পরে যখন আমার নিকট থেকে কোন জীবন বিধান তোমাদের নিকট পৌছুবে, তখন যারা আমার সেই বিধানের আনুগত্য করবে তাদের জন্য কোন ভয় নেই এবং তারা দুর্দশাগ্রস্ত ও হবে না।' (সূরা বাকারা : ৩৮)

আল্লাহর পক্ষ থেকে জীবন বিধান নাযিল করার এই ধারাবাহিকতা হযরত আদম আ. থেকে শুরু করে পরবর্তী সকল পয়গাম্বরগণের সময়ে অব্যাহত থাকে। পয়গাম্বরগণ পৃথিবীর বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন স্থানে দীন তথা সেই জীবন বিধান প্রচারের কাজ করেন। সেই সূত্রে আইন ও জীবন বিধান পালনের রেওয়াজ ক্রমান্বয়ে পৃথিবীর সর্বত্র গড়ে ওঠে। এই বিধানেরই পূর্ণতা সম্পন্ন হয় শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সা. এর আনীত ধর্মের মাধ্যমে। তাই পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের জীবন বিধান পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং তোমাদের জন্য আইন ও জীবন বিধানরূপে ইসলামকেই গ্রহণ করার মর্মে আমি আমার সন্তুষ্টি ঘোষণা করলাম।' (সূরা মায়েদা ৫:৩)

ইসলাম হচ্ছে একমাত্র জীবন ব্যবস্থা যা মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনকে একই সূত্রে গেঁথে রাখে। ইসলাম একদিকে স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক সমুন্নত করে, অন্যদিকে এক সৃষ্টির সাথে অপর সৃষ্টির সম্পর্ক অটুট ও অব্যাহত রাখে। মানুষের এই দ্বিবিধ সম্পর্কের পরিগঠন ও পরিশীলনের জন্য ইসলামী শরীয়তে যে সকল নিয়ম কানুন ও নীতিমালা বিধৃত হয়েছে, সেগুলিই হলো ইসলামী আইন। এই আইনের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভপূর্বক সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা করা, প্রত্যেকের প্রাপ্য অধিকার ভোগের ব্যবস্থা করা, কোনরূপ অনধিকার চর্চা থেকে নিজে বিরত থাকা ও অপরকে বিরত রাখা এবং সকলকে নিজ নিজ কর্তব্য পালনে ও দায় বহনে বাধ্য করা। বস্তুত ইসলামী আইন কালজয়ী, কালোত্তীর্ণ ও যুগশ্রেষ্ঠ। এই আইন বহুতর বৈশিষ্টমণ্ডিত ও সার্বিক কল্যাণকর।

লেখক : বিশিষ্ট মুহাদ্দিস, গবেষণা কর্মকর্তা ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ইসলামী আইনের প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট হচ্ছে– এর ভিত্তিগত পবিত্রতা। এই আইনের ভিত্তি হলো ঐশী ভিত্তি। যুগে যুগে নবীগণের প্রতি যে ওহী নাযিল হয় সেগুলোই বিভিন্ন সমাজে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে আইনের আকারে প্রতিফলিত হয়। এই আইনের গোড়া অত্যন্ত পবিত্র। এই আইনের উৎস মহান আল্লাহ্ প্রেরিত ওহী তথা পবিত্র কুরআন ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ। কুরআন মজীদে কোন আইন সংক্ষিপ্তভাবে ব্যক্ত থাকলে মহানবী স. তাঁর কথা ও কাজের মাধ্যমে তার বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কি ধরনের ব্যবস্থা বা কি ধরনের বিধান ও কর্মপন্থা মানুষের জন্য কল্যাণকর তা আল্লাহ ও তাঁর রসূলই অধিক ভালো জানেন। এ আইন পবিত্র, নির্ভরযোগ্য, বিভ্রান্তি ও বাতুলতামুক্ত। ইরশাদ হচ্ছে–

'এ ওহীর মধ্যে কোন মিথ্যা অনুপ্রবেশ করতে পারে'না, অগ্র থেকেও নয় পশ্চাৎ থেকেও নয়। এটি প্রজ্ঞাময় প্রশংসার্হ আল্লাহর নিকট থেকে অবতীর্ণ।' (সূরা হা মীম সাজদা ৪১ :৪১)

এই আইনের অপর বৈশিষ্ট হলো সর্বজনীনতা। মানব রচিত পাশ্চাত্য আইনের প্রয়োগ যেখানে একটি রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ, সেখানে ইসলামী আইন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত সকল মুসলমানের, বরং সমগ্র মানব জাতির ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। ইসলামী আইনের প্রয়োগ সর্বজনীন।

এই আইনের মধ্যে রয়েছে অপরূপ অভিন্নতা। বর্তমান বিশ্বে আইন প্রণীত হয়ে থাকে কোন একটি সমাজের বিশেষ প্রয়োজন, বিশেষ কোন আশা-আকাঙ্খা এবং নিজেদের সামাজিক সমস্যার সমাধান ও সুবিধা সৃষ্টি কল্পে। তাই আইনের অনুশীলন ও প্রয়োগে পরিলক্ষিত হয় বিভিন্নতা। কিন্তু ইসলামী আইন মুসলিম বিশ্বের সকল জনগোষ্ঠীর জন্য সমান ও অভিন্ন। ইসলামী আইনে চারটি মতবাদ (হানাফী, মালিকী, শাফিঈ এবং হাম্বলী) থাকলেও তাদের মধ্যে আইনের মৌলিক বিষয়ে কোন পার্থক্য নেই। কিছু ভিন্নতা থাকলেও এই ভিন্নতা কতিপয় বিস্তারিত ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে মাত্র।

যে কোনো আইনের অপরিবর্তনীয়তা সেই আইনকে সুদৃঢ় স্থিতির উপর প্রতিষ্ঠিত করে। ইসলামী আইনে এই বিশেষণ বিদ্যমান। এই আইনের যে অংশ পবিত্র কুরআন মজীদে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত আছে এবং রসূলুল্লাহ সা.এর সুন্নায় বিধৃত হয়েছে সেগুলো অপরিবর্তনীয় ও স্থায়ী। স্থান-কালের পরিবর্তনে তাতে পরিবর্তনের কোন সুযোগ নেই। উদাহরণস্বরূপ খুনের শাস্তি হিসাবে কুরআন মজিদে মৃত্যুদণ্ডে ব্যবস্থা দেয়া হয়েছে এবং সঙ্গে বাদী ও বিবাদীর মধ্যে সমঝোতার সুযোগও রাখা হয়েছে। পক্ষদ্বয়ের মধ্যে সমঝোতা না হলে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবে। রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ বা কারো কোন এখতিয়ার বা অধিকার নেই। মৃত্যুদণ্ড বা সমঝোতার পথ রুদ্ধ করার বা বল প্রয়োগ বা ভীত সন্ত্রস্ত করে সমঝোতা করতে বাধ্য করার কোনো অবকাশ নেই।

আবার ক্ষেত্র মতে এখানে পরিবর্তনশীলতাও রয়েছে। ইসলামী আইনের এমন একটি অধ্যায় আছে যা স্থান-কাল পাত্র ও পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে নিত্য পরিবর্তনশীল বা

পরিবর্তনযোগ্য। উদাহরণ স্বরূপ রাষ্ট্র জনগণের নিকট থেকে যাকাত বা উশর (কৃষিজ উৎপাদনের এক-দশমাংশ) আদায় করার পর রাষ্ট্রীয় সংগঠন পরিচালনা, দুর্যোগ মোকাবিলা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য তাদের উপর বিভিন্ন প্রকার কর আরোপ করতে পারে। আবার ইচ্ছা করলে এসব কর প্রত্যাহারও করতে পারে। অনুরূপভাবে কোন কোন অপরাধের ক্ষেত্রে ইসলামী আদালত স্থান-কাল-পাত্র ও পরিস্থিতির বিবেচনায় লঘু দণ্ড প্রদান করতে পারে। পরিবর্তনশীলতার বিষয়গুলো কেবল ইসলামী আইনে উচ্চতর প্রজ্ঞার অধিকারী বিশেষজ্ঞগণের ইজতিহাদের ভিত্তিতেই সংঘটিত হবে।

ঐক্য ও অখণ্ডতা ইসলামী আইনের ভূষণ। আধুনিক আইন বিজ্ঞান ইবাদত বন্দেগী সংক্রান্ত আইনসমূহকে আইন হিসাবে মোটেই বিবেচনা করে না। অথচ যে যেই ধর্মের অনুসারী হোক না কেন, সকলেই ইবাদত বন্দেগী করে থাকে। আধুনিক আইন বিজ্ঞানে এ অংশকে বাদ দিয়ে রাখা বস্তুত নিজ গবেষণা ক্ষেত্রের অঙ্গহানি ঘটানোর নামান্তর। কিন্তু ইসলামী আইন বিজ্ঞান (উলূমূল ফিক্হ) অন্যান্য যাবতীয় আইনের সাথে ইবাদত বন্দেগী সংক্রান্ত আইনসমূহকেও সম মর্যাদায় একই সূত্রে গেঁথে রাখে। উদাহরণ স্বরূপ কোন মুসলিম ব্যক্তি নামায না পড়লে ইসলামী রাষ্ট্র তাকে নামায পড়তে বাধ্য করে। সে নামায পড়তে কোনক্রমেই সম্মত না হলে কিংবা নামাযকে শরীয়তের একটি আদেশ হিসাবে মেনে নিতে অস্বীকার করলে রাষ্ট্র তার উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করে। কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্য আইনবিজ্ঞানের এখানে কোন ভূমিকা নেই। অতএব দেখা যায় যে, মানুষের জাগতিক জীবন ও ধর্মীয় জীবন উভয়ের মধ্যে ইসলামের গোটা আইন ব্যবস্থায় গভীর সমন্বয় ও অখণ্ডতা বিদ্যমান।

ইসলামী আইনের একটি বৈশিষ্ট হচ্ছে, এটি ক্ষেত্র বিশেষে বাধ্যতামূলক আবার ক্ষেত্র বিশেষে ঐচ্ছিক। এই আইনের একটি অংশ সকল মুসলমানের মান্য করা বাধ্যতামূলক এবং অপরাংশ বাধ্যতামূলক নয়, সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক। উদাহরণ স্বরূপ শূকরের গোশ্ত বর্জন করা সকল মুসলমানদের জন্য বাধ্যতামূলক। এতে কারো জন্য কোন অব্যাহতির সুযোগ নেই। কিন্তু কুরআন ও হাদীসে যেসব বিষয়ে হালাল হওয়া বা হারাম হওয়া সম্পর্কে কিছুই বলা হয় নি বা হারাম হওয়ার যেসব মূলনীতি আছে সে সব মূলনীতির আওতায়ও সেগুলো পড়ে নি এই অবস্থায় মুসলমানগণ তা গ্রহণও করতে পারে আবার বর্জনও করতে পারে।

সমঝোতার ব্যবস্থা থাকা যে কোন আইনে জরুরী। কোন বিবদমান বিষয় আদালতে উত্থাপনের পূর্বে ইসলামী আইনে পক্ষবৃন্দের সমঝোতার মাধ্যমে নিজেরা তা নিষ্পত্তি করে নেয়ার সুযোগ রাখা আছে। এই সমঝোতার সুযোগ বিশেষত আর্থিক বিষয় সংক্রান্ত ক্ষেত্রেই বেশিরভাগ প্রযোজ্য। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, 'কোন স্ত্রী যদি নিজ স্বামীর দুর্ব্যবহার ও উপেক্ষার আশংকা করে তাহলে তারা আপোষ নিষ্পত্তি করতে চাইলে তাদের কোন দোষ নেই। আপোষ নিষ্পত্তিই শ্রেয়।' (সূরা নিসা ৪ : ১৮)

ইসলামী আইনে আছে বিশ্বাসের স্বাধীনতা। ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী বিধর্মী নাগরিকগণ এবং পূর্বানুমতি লাভপূর্বক ইসলামী রাষ্ট্রে আগত বিধর্মীগণ ইসলামী আইনের আওতায় ব্যাপকভাবে তাদের নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাসের স্বাধীনতা ভোগ করে। ইসলামী আইনে সবচেয়ে জঘন্য অপরাধ হলো মূর্তি নির্মাণ ও মূর্তির পূজা অর্চনা করা। কোন মুসলমান উক্ত অপরাধে লিপ্ত হলে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড । কিন্তু অমুসলিমদের বেলায় এই আইন সম্পূর্ণ উদার। তারা স্বাধীনভাবে মূর্তি বানাতে পারে এবং মূর্তির পূজা অর্চনা করতে পারে। এমন কি ইসলামী আইন মুসলমানদেরকে বিধর্মীদের এইসব দেবদেবীকে গালি দিতেও নিষেধ করেছে। যেমন কুরআন মজিদে বলা হয়েছে, 'আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে তারা ডাকে তাদেরকে তোমরা গালি দিও না, কেন না তারা সীমালঙ্ঘন করে আল্লাহকেও গালি দিয়ে বসবে। এভাবে আমি প্রত্যেক জাতির দৃষ্টিতে তাদের কার্যকলাপ সুশোভন করে দিয়েছি। অতপর তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদের প্রত্যাবর্তন। অনন্তর তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকার্য সম্পর্কে অবহিত করবেন।'

(সূরা আনআম ৬:১০৮)

ইসলামী আইনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট হলো গতিশীলতা। স্থান-কালের ব্যবধান এ আইনের গতিশীলতাকে রুদ্ধ করতে পারে না। সমস্যা যতই কঠিন ও আধুনিক হোক, যতই ক্ষুদ্র বা বৃহৎ হোক, সব ক্ষেত্রেই ইসলামী আইনের একটি স্পষ্ট বক্তব্য আছে। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে কোন উদ্ভূত বিষয়ে আইন বিধৃত না থাকলেও অবশ্যই তাতে আইনটির একটি মূলনীতি বিবৃত রয়েছে। সেই মূলনীতির ভিত্তিতেই মুজতাহিদ আইনজ্ঞগণ (ফকীহগণ) উদ্ভূত পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আইন প্রণয়ন করতে সক্ষম হন। ইসলামে রয়েছে আইন প্রণয়নে মানবীয় আকল বিবেক বুদ্ধি প্রয়োগের বিরাট সুযোগ। মানব বুদ্ধির এই প্রয়োগ সরাসরি মহানবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ স. কর্তৃক অনুমোদিত ও সূচিত। তিনি নিজের প্রিয় সাহাবী হযরত মুআয ইবন জাবাল রা.কে ইয়েমেনের শাসক বা প্রধান বিচারপতিরূপে প্রেরণকালে বলে ছিলেন, 'তুমি কিসের ভিত্তিতে ফয়সালা করবে? মুআয উত্তর দিলেন, মহান আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী। মহানবী বললেন, যদি তুমি তাতে সমাধান খুঁজে না পাও ? তিনি বললেন, তা হলে আমি আল্লাহর রসূলের সুন্নাহ মোতাবেক ফয়সালা করব। মহানবী বললেন, তুমি যদি তাতেও সমাধান খুঁজে না পাও? তিনি বললেন, তাহলে আমি আমার ইজতিহাদ তথা আকল ও বিবেক বুদ্ধি প্রয়োগ করে সিদ্ধান্ত খুঁজে বের করব।' এভাবেই কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত মূলনীতির অধীনে বিশেষজ্ঞ আইনবিদগণ তাঁদের গবেষণা তথা ইজতিহাদের মাধ্যমে ইসলামী আইন সচল ও সক্রিয় রাখেন। একখানা হাদীসে মহানবী সা. ইরশাদ করেন, 'মহান আল্লাহ আমাকে যে হিদায়াত ও ইলম দিয়ে পাঠিয়েছেন তার উদাহরণ হলো, যেন মুষলধারে বৃষ্টি যা ভূমির উপর পতিত হয়েছে। ফলে ভূমির স্বচ্ছ অংশ সেই পানি ধারণ করে, তা থেকে ঘাস ও প্রচুর গাছপালা জন্মায়। ভূমির কোন কোন অংশ শক্ত মাটির যা পানিকে জমা করে রেখেছে। ফলে তা দ্বারা আল্লাহ মানুষকে উপকার সরবরাহ করেছেন। লোকেরা সেখান থেকে পানি তুলে নিয়ে পান করে,

জীবজন্তুকে পান করায় ও ক্ষেতে পানি দেয়। বৃষ্টির সেই পানি এমন ভূমিখণ্ডেও পতিত হয়েছে যা উসর ভূমি, পানি ধরেও রাখে না আর ঘাস পাতাও জন্মাতে পারে না। এটি উদাহরণ হলো এমন ব্যক্তির যে আল্লাহর দীন উপলব্ধি করেছে এবং আল্লাহ যে মহাসত্য দিয়ে আমাকে পাঠিয়েছেন তা শিক্ষা করেছে ও করিয়েছে এবং এমন ব্যক্তির যে এই দীনের প্রতি মাথা তুলেও তাকায়নি আর আল্লাহ আমাকে যে হিদায়াতসহ পাঠিয়েছেন তা কবুল করে নি।' (সহীহ বুখারী, কিতাবুল ইলম)

ইসলামী আইন সর্বক্ষেত্রে সংগতিপূর্ণ। ইসলামী আইনের কোথাও কোন অসংগতি নেই। এই আইন দীর্ঘ কাল প্রয়োগের মাধ্যমে পরীক্ষিত। ইতিহাস সাক্ষী, উমাইয়্যা শাসন, বৃহৎ আব্বাসী শাসন, উসমানী ও মুঘল শাসন ব্যবস্থা শত শত বছর পরিচালিত হয়েছে ইসলামী আইনের দ্বারা। এমনকি মুঘল শাসনের পূর্বেও উপমহাদেশের সুলতানী শাসন পরিচালিত হয়েছে ইসলামী আইন দ্বারা। এ কথা বললে মোটেও অত্যুক্তি হবে না যে, ব্রিটিশরা ভারতের জন্য যে আইন কাঠামো রচনা করে তাতেও ব্যাপকভাবে ইসলামী আইনের উপাদান বিদ্যমান, যদিও তারা নিজেদের সুবিধা ও ইচ্ছামত তাতে বহু বিকৃতি সাধন করেছে।

বস্তুত ইসলামী আইনের বৈশিষ্ট বহুবিধ। মুসলিম উম্মাহর ঐক্য, সংহতি, অগ্রগতি ও আখিরাতের মুক্তি নির্ভর করে এই আইনের সফল বাস্তবায়নের উপর। মুসলমানদেরকে নিজেদের স্বার্থেই ইসলামী আইনকে কার্যকর করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এতেই সকল মানুষের কল্যাণ নিহিত।

নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলামী বিধান

শফীকুল ইসলাম গওহরী

চলমান শতাব্দীতে নারী বিশ্বের একটি সর্বাধিক আলোচিত বিষয়। গোটা বিশ্বে বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীতে যে বিষয়গুলো আলোড়ন সৃষ্টি করেছে নারী অধিকার এর অন্যতম। নারীই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান গৌরবোজ্জল ব্যক্তিত্বের অধিকারী মহাপুরুষদের জীবনের প্রধান ভিত্তি। আমাদের সমাজ জীবন নারীকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে।

রসূল স. পৃথিবীর বুকে আগমন করে নারী সমাজকে সর্বাধিক নির্যাতিত বঞ্চিত উপেক্ষিত দেখেছেন। তাই তিনি বঞ্চিত প্রবঞ্চিত নারীর প্রতি মনোনিবেশ করেছিলেন। রসূল স. এর অনুগ্রহ ও অবদানের কথা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা এ ক্ষুদ্র পরিসরে সম্ভব নয়। তাঁর সর্বোত্তম আদর্শের কিঞ্চিৎ রূপরেখা এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করব। তবে নারীদের প্রতি রসূল স.-এর আচরণ ও অনুগ্রহের ব্যাপারটি সংক্ষেপে এতটুকু বলা যথেষ্ট, যে নারীকে মনে করা হতো পাপের দরজা, যাদেরকে নীচ হীন ও অপমানকর মনে করা হতো সেই নারীর নামে আল্লাহ তাআলা সূরা নাযিল করেছেন। পক্ষান্তরে আর্‌রিজাল নামে কুরআনের কোথাও কোন সূরা পাওয়া যাবে না। তাছাড়াও কুরআনের আরেকটি সূরার পবিত্র স্বভাবের অধিকারীনী হযরত মারিয়াম আঃ-এর নামে নামকরণ করা হয়েছে। এতে সহজেই অনুমান করা যায় ইসলাম নারীকে কতটা মর্যাদা দিয়েছে।

নারী ইহুদী ধর্মে

ইহুদী ধর্মে নারীকে পুরুষের বিভীষণ বলে অভিহিত করা হয়েছে। ইহুদী ধর্মে পিতা স্বীয় কন্যাকে নগদ অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করতে পারত। মেয়ে কখনো পিতার সম্পত্তি থেকে অংশ পেত না। নারীকে সকল পাপের মূল (Root of all evils) মনে করা হতো।[১] তা ছাড়া একাধিক বিবাহের ব্যাপারে তাওরাতে কোনো সীমা বর্ণিত হয় নি। হযরত দাউদ আঃ ও হযরত মূসা আঃ এর যথাক্রমে ছয়জন ও দু'জন স্ত্রী ছিল। তালাক নিষিদ্ধ ছিল না, তবে এর পদ্ধতি এই ছিল যে, স্বামীর যদি স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ না থাকতো তাহলে তালাকনামা লিখে তা হাতে দিয়ে তাকে ঘর থেকে বের করে দিলেই হতো। উত্তরাধিকার বিধান ছিল পিতার যদি কোন ছেলে না থাকে তবে মেয়েরা সম্পদ পাবে, আর কোন ছেলে যদি থাকে তবে মেয়ে কোন সম্পদ পাবে না।

লেখক : গবেষক, মুদাররিস দারুল উলূম রামপুরা, ঢাকা।

খৃষ্টান ধর্মে নারী

খৃষ্টান ধর্মে নারীদের মর্যাদা একেবারে ন্যাক্কারজনক। খৃষ্টান ধর্ম গ্রন্থে বলা হয়েছে, হযরত আদম আ. শয়তানের ধোকায় পড়েননি, ধোকা খেয়েছে নারী, তাই নারীই প্রথম পাপে লিপ্ত হয়েছে। নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ার জন্য আদমকে প্ররোচিত করে নারী আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার অপরাধে অপরাধি সাব্যস্ত হয়েছে। এভাবে আদমসহ তার সন্তানদেরকে বেহেশত থেকে বের করে কিয়ামত পর্যন্ত দু:খ কষ্ট ভোগ করার সমস্ত দায়-দায়িত্ব খৃষ্ট ধর্মে একতরফাভাবে নারীর উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। মূল বিশ্বাস হচ্ছে, যেহেতু সমস্ত পাপের সূচনাকারিনী হযরত হাওয়া আ. তাই নারীদেরকে বিবাহ না করাই উত্তম। স্টেপল বলেন- নারীকে স্পর্শ না করাই পুরুষের জন্য উত্তম। খৃষ্ট ধর্মে নারী সমাজকে মানুষের চোখে ঘৃণিত বস্তুতে পরিণত করা হয়। ফলে সন্তান পর্যন্ত মাকে ঘৃণা করত। অনুরূপভাবে খৃষ্ট ধর্মে তালাকের কোন বিধান ছিল না, ফলে একবার কারো সাথে বিবাহ হয়ে গেলে বিচ্ছেদের কোন পথ ছিল না। পর নারীর সাথে ব্যভিচার বা খৃষ্ট ধর্ম ত্যাগকে তারা আত্মিক ব্যভিচার বলে অভিহিত করে। তাদের দৃষ্টিতে নারী হচ্ছে নরকের দরজা। শয়তানের মুখপাত্র (Organ of evil)[২]

নারী বৌদ্ধ ধর্মে

নারীকে তারা একমাত্র বিলাসিতার উপকরণ মনে করত। এ কারণেই তারা স্ত্রী গ্রহণ থেকে বিরত থেকে একাকী জীবন-যাপন উত্তম মনে করত। বুদ্ধদেব নিজে সত্য সাধনার জন্য স্ত্রী কন্যা ত্যাগ করে বনে বসবাস করেছিলেন।[৩]

নারী হিন্দু ধর্মে (ভারতবর্ষে)

মনুর সংহিতায় নারী সর্বদাই দুর্বল ও অবিশ্বাসী বিবেচিত হয়েছে এবং নারী ঘৃণা ও অবজ্ঞার সঙ্গেই উল্লেখিত হয়েছে।[৪] স্বামী মারা গেলে স্ত্রী জীবন্মৃতের ন্যায় হয়ে যেত। সে আর দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারত না। তার ভাগ্যে জুটত তীব্র ভর্ৎসনা, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, ঘৃণা-অবজ্ঞা। বিধবা হওয়ার পর তাকে মৃত স্বামীর ঘরের চাকরানী ও দেবরদের সেবা দাসী হয়ে থাকতে হত।[৫] হিন্দু দার্শনিক দিবানন্দ দাস বলেন, বিধবা নারী যদি যুবতী হয় তাহলে সে তার দেবর বা অন্য কোন পুরুষের সাথে যৌন সম্পর্ক রাখতে পারবে। হিন্দুধর্মে বন্ধা মহিলাদের স্বামীর অনুমতিতে অন্য পুরুষের সাথে দৈহিক সম্পর্ক রাখা বৈধ ছিল।[৬] ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করেছেন, হিন্দুদের একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় এমন ছিল যে তাদের পুরুষেরা উলঙ্গ নারীদের এবং নারীরা উলঙ্গ ও নগ্ন পুরুষদের পূজা করত।[৭] প্রাচীন হিন্দু ভারতীয় শাস্ত্রে বলা হয়েছে, মৃত্যু নরক বিষ সর্প আগুন এর কোনটিই নারী অপেক্ষা মারাত্মক নয়। মনুর বিধানে উল্লেখ আছে, নারীর পিতা স্বামী ও সন্তানের কাছে

থেকে কোন কিছু পাওয়ার অধিকার নেই। হিন্দু সমাজে দেবতার সন্তুষ্টির জন্য বা বৃষ্টি ও ধন-সম্পদের জন্য নারীকে বলিদান করা হত। সতিদাহ প্রথার প্রচলন ছিল। মনু নারী সম্পর্কে বলেছেন- নারী নাবালেগ হোক, যুবতী হোক আর বৃদ্ধা হোক স্বাধীন নয়।

নারী রোম ও গ্রীসে

প্রাচীন গ্রীস ও রোমেও নারীর মর্যাদা ছিল নিতান্ত অধঃপতিত। তাদের দৃষ্টিতে নারী একটি নিকৃষ্ট জীব। তারা নারীদেরকে সন্তান জন্ম দানের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতো। হাটে বাজারে প্রকাশ্যে নারী বেচা কেনা হত। যে যত ইচ্ছা স্ত্রী রাখতে পারত। গ্রীক সভ্যতায় স্ত্রী অস্থাবর সম্পত্তির মতো অন্যের কাছে হস্তান্তরযোগ্য বলে বিবেচিত হত। স্বামীর ঘরে স্ত্রীরা শুধুমাত্র সেবিকার দায়িত্ব পালনের জন্য আসতো। আর পুরুষরা সবচেয়ে বেশি যে ধারণা পোষণ করত তা হচ্ছে, আমরা যৌনতৃপ্তি অর্জনের জন্য পতিতালয় গমণ করবো। আর স্ত্রীদেরকে সেবিকা স্বরূপ ব্যবহার করবো।[৮] রোমান সভ্যতা গ্রীক সভ্যতারই ফসল। রোমান সভ্যতায় নারী বিয়ের পূর্বে পিতার সম্পদ আর বিয়ের পর স্বামীর সম্পদ বলে বিবেচিত হতো। ব্যভিচার ছিল সর্বত্র। তারা অবাধে ব্যভিচারে নিমজ্জিত ছিল।[৯]

ইরানে নারী

ইরানী দর্শন ও সমাজ ব্যবস্থায় নারী ছিল বঞ্চনার শিকার। সে দেশের ভ্রান্ত উদভ্রান্ত আধারচারী দার্শনিক মাযদেক এর মতে নারী হচ্ছে জমির মতই। তার এই অর্থহীন উদ্ভট ও ভ্রান্ত চিন্তা ইরানী নারী সমাজকে এমনভাবে ঝাকুনি দিয়েছিল যে, সেখানে নারীর আপন-পর, মাহরাম গায়ের মাহরামের মাঝে কোন ভেদাভেদ ছিল না, বন্য পশুর মত নারী ছিল সকলেরই ভোগের সামগ্রী।

ইরানীদের মতে দুনিয়ার সকল অনিষ্টের মূল হচ্ছে দুটো যথা-১. নারী, ২. ধন সম্পদ। তাদের নিকট সব নারীই সব পুরুষের জন্য বৈধ স্ত্রী তুল্য। যে কোন পুরুষ যে কোন নারীকে স্ত্রী সম্ভোগের মত ব্যবহার করতে পারবে। তাদের সেই সমাজে ভাই বিয়ে করত সহোদরা বোনকে। এমন কি নিজ ঔরসজাত সন্তানকেও বিয়ে করত। পারস্যের দ্বিতীয় সম্রাট দ্বিতীয় ইয়াযদগির্দ, যিনি ৫ম শতাব্দীর মাঝামাঝিতে রাজত্ব করেছিলেন। আপন কন্যাকে বিবাহ করেন এবং হত্যাও করেন।[১০] খৃষ্টীয় ষষ্ট শতাব্দীর শাসক বাহরাম চুবীন আপন বোনের সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন।[১১] এ ব্যাপারে অধ্যাপক আর্থার ক্রিস্টিন সেন এর বর্ণনা হচ্ছে, ইরানে এ জাতীয় সম্পর্ককে কোন রকম অবৈধ কাজ মনে করা হত না। বরং এ জাতীয় কাজকে ইবাদত ও পূণ্য মনে করা হত। বিখ্যাত চীনা পর্যটক হিউয়েন সাঙ বর্ণনা করেন, ইরানী আইন ও সমাজে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপনের জন্য কোন প্রকার সম্পর্কের বাছ-বিচার ছিল না।[১২] ইরানের মাযদেক ঘোষণা করেছিলেন, তামাম মানব জাতি অভিন্ন। তাদের ভেতর কোন পার্থক্য নেই। শাহরিস্তানীর ভাষায়, মাযদেক মহিলাদেরকে সকলের জন্য বৈধ সাব্যস্ত করেন এবং নারীকে ধনসম্পদ আগুন-পানি ও ঘাসের মত সর্ব সাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেন এবং

সর্বসাধারনের ব্যবহার যোগ্য বলে ঘোষণা দেন। এর ফলে দেখতে না দেখতেই এমন অবস্থা সৃষ্টি হলো যে বাপ তার সন্তানকে যেমন চিনতে পারত না তেমনি সন্তান চিনতে পারত না তার বাপকে।[১৩] বর্তমানে পশ্চিমা বিশ্বে তদ্রুপ অবস্থা বিরাজ করছে। পাশ্চাত্যে বর্তমান প্রজন্মের অধিকাংশ সন্তান তার জন্মদাতাকে চিনতে পারে না।

চীন দেশে নারী

চীনে নারীর জীবন পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ অমানবিক। সে দেশে নারীদের দিয়ে লাঙ্গল টানানো, বোঝা বহন করানো হত। সামান্য অপরাধেই দেয়া হত চাবুকের আঘাত। বিত্তবান লোকেরা নারীদের ঘাড়ে চড়ে ভ্রমণে বের হত। বাজারে গোশতের অভাব হলে তারা মেয়ে মানুষ কিনে এনে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কেটে রান্না করে নিজেরা খেত আর মেহমানদেরও খাওয়াতো। মেয়ে বড় হয়ে উঠলে তাকে বন্ধ ঘরে আবদ্ধ করে রাখা হত। বিয়ের পর স্বামীর ঘরে যাওয়ার সময় চোখের পানি ফেলা নিষিদ্ধ ছিল।[১৪]

নারী ইসলামে

উপরযুক্ত বিশ্ব পরিস্থিতিতে রসূল স. এ ধরাধামে আগমন করেন। তিনি নারীকে সম্মানের আসনে সমাসীন করেন। তাদের বৈধ সব অধিকার নিশ্চিত করেন। এমন এক বিধান দান করেন যাতে নারীর মর্যাদা সম্মান ও গুরুত্ব যথাযথভাবে সংরক্ষিত হয়েছে। নারীকে ইসলাম যে সমস্ত অধিকার দিয়েছে সে বিষয়ে আলোকপাতের পূর্বে ইসলামে নারীর গুরুত্ব ও সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে মৌলিক সিদ্ধান্তটি তুলে ধরা অধিক সমীচিন হবে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে : 'পুরুষেরা নারীদের উপরে কর্তৃত্বশীল।' এ জন্য যে, আল্লাহ তাদের একের উপর অন্যকে বিশিষ্টতা দান করেছেন এবং এ জন্য যে তারা নারীদের জন্যে তাদের অর্থ ব্যয় করে।[১৫]

পুরুষ কর্তৃত্বশীল হওয়ার অর্থ

আরবী 'কাওয়াম' শব্দের বাংলা রূপ হলো কর্তা, কর্তৃত্বশীল। এর দ্বারা পুরুষের মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়া হয়নি, বরং পুরুষের প্রতি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। কর্তৃত্বশীল বানিয়ে বলা হয়েছে যে, বংশীয় শৃঙ্খলা, সামাজিক রীতিনীতি প্রতিষ্ঠা, জীবন যাত্রার সার্বিক নিয়ন্ত্রণের ভার পুরুষদের কাঁধে তুলে দেয়া হয়েছে। সেই তুলনায় নারীদের দায়িত্ব লঘু।

সমান অধিকার নয় ন্যায় বিচার

অনেকে বলে থাকেন যে ইসলামে নারী ও পুরুষকে সমানাধিকার দেয়া হয়েছে। এটা তাদের একটা ধারণা মাত্র। আর সে ধারণা মতেই তারা বলে থাকেন। বরং ইসলাম এ ক্ষেত্রে ন্যায় বিচার তথা ইনসাফের নির্দেশ দিয়েছে। ইনসাফ তথা ন্যায় বিচার বলতে সমতা বা সমান সমান নয় বরং ইনসাফ বলা হয় যার জন্য যেটা যথার্থ এবং শোভনীয় তাকে সেটা দেয়া। নারী-পুরুষের স্বভাব সামর্থের মধ্যে প্রকৃতিগতভাবেই মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। তাই এ প্রাকৃতিক ব্যবধানকে সামনে রেখে প্রত্যেকের জন্য কর্তব্য

নির্ধারণ করতে হবে, এটাই যুক্তিযুক্ত। প্রাকৃতিক ও সামাজিক জীবন বিধান শৃঙ্খলা কর্তব্য ও অধিকারের বিষয়ে প্রতিটি ব্যক্তির যোগ্যতা ও কাজের প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। সমাজে নর-নারী, ছোট-বড়, যুবক-বৃদ্ধ, শিক্ষিত, আমীর ফকীর নানা শ্রেণীর লোক থাকে। যদি সকল নাগরিককে একই পাল্লায় মাপা হয় তাহলে সেটা প্রকৃতি বিরোধী হবে। এ কারণেই ইসলাম ও ইসলামের নবী নারী-পুরুষের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেছেন, সমানাধিকার নয়।

নর-নারী পরস্পর সহযোগী প্রতিপক্ষ নয়

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রভুকে ভয় কর। যিনি তোমাদের একই ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তা থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন।[১৬] এ থেকে বুঝা যায় নর-নারী উভয়ে একই প্রাণ থেকে সৃষ্ট। পাশ্চাত্যে নরনারীকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে মুখোমুখি দাঁড় করানো হয়েছে। পৃথিবীর প্রায় সব দেশে নারী অধিকারের নামে বিভিন্ন নারীবাদী সংগঠন গড়ে উঠেছে। নারী ও পুরুষ একে অপরের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই মুখোমুখি অবস্থানকে প্রত্যাখ্যান করে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতময় এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে কুরআন বলেছে, 'পুরুষ থেকেই তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করা হয়েছে।'[১৭]

এ আয়াতের মর্মার্থ হলো, নারী পুরুষেরই বিশেষ অংশ, তারা পরস্পর পরস্পরের সম্পূরক, প্রতিপক্ষ নয়। এটা মানুষের স্বভাব। মানুষ যখন কাউকে তার প্রতিপক্ষ ভাবতে শুরু করে তখন তার প্রতি ঘৃণাবোধ ক্ষোভ ও ক্রোধ জাগ্রত হয় নীরবে নি:শব্দে। আর যাকে আপন মনে করে তাকে নিজের সম্পূরক ও নিজ জীবনের সহায়ক শক্তি মনে করে। এবং তার প্রতি এক অব্যাক্ত দরদ প্রেম ও ভালোবাসা অনুভূত হয়। এ আয়াতটিতে মানুষের মধ্যে সেই সুপ্ত প্রেম ও প্রেরণার বিষয়টিই বিবৃত হয়েছে।

মূল কথা হলো, ইসলাম নারীকে পুরুষের পরিশিষ্ট মনে করে না বরং নারীকে পুরুষের মতই অধিকার দিয়েছে। কুরআনুল করীমে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে- পুরুষ হোক কিংবা নারী, যে কোন সৎকর্ম করে এবং বিশ্বাসী হয়, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রাপ্য তিল পরিমাণও নষ্ট করা হবে না।[১৮] ইসলাম নারীকে সম্পদের মালিকানা দিয়েছে। নিজের সম্পদ নিজের ইচ্ছানুযায়ী ব্যয় করার এবং লেনদেন ও কারবার করার অধিকার দিয়েছে। নারী তার মৃত নিকটাত্মীয়ের সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে। তার অংশের মধ্যে অন্য কেউ তার অনুমতি ছাড়া কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

প্রতিবাদের অধিকার

ইসলাম পুরুষদের ন্যায় নারীদেরকেও সমালোচনার অধিকার প্রদান করেছে। এ কারণেই ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, হযরত আয়শা রা. হযরত আলী রা.-এর বিপক্ষে হযরত উসমান রা. এর হত্যাকারীদের বিচার দাবি করেছিলেন। খলীফাতুল মুমিনীন হযরত ওমর রা. এর খিলাফতকালে বিবাহে অধিক মহরের প্রচলন শুরু

হয়েছিল। খলিফা অবস্থা বিশ্লেষণ করে বিয়েতে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ মোহর নির্ধারণ করে দিলেন। কিন্তু এ ঘোষণা শ্রবণ করে জনৈক মহিলা সাহাবী সকলের উপস্থিতিতে খলিফাকে চার্জ করলেন, ইয়া খলীফাতুল মুমিনীন, কুরআন এ ব্যাপারে কোন সীমারেখা প্রদান করেনি, কাজেই সীমা নির্ধারণের অধিকার আপনাকে কে দিয়েছে ? হযরত ওমর রা. এ কথা শুনে নির্দ্বিধায় নিজের রায় প্রত্যাহার করে নিলেন এবং বললেন– 'একজন পুরুষ ভুল করেছে আর যথার্থ রায় দিয়েছে একজন নারী।'

নারীদের সমাবেশের অধিকার

রসূল স. নারীদেরকে ইজতেমা তথা সমাবেশের অধিকার দিয়েছেন। একবার নারীদের একটি দল রসূল স. এর কাছে এসে অভিযোগ করলো, 'পুরুষেরা আপনার সাহচর্য গ্রহণ করে আমাদের চেয়ে এগিয়ে গেছে। আমাদের জন্যও একটা সময় নির্ধারণ করে দিন।' এ দাবী পূরণ করার লক্ষে রসূল স. মহিলাদের জন্য সপ্তাহে একদিন নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। সপ্তাহে মেয়েদের একটি সমাবেশ হত। আর সে সমাবেশের বক্তা হতেন রসূল স. আর শ্রোতা শুধুই মহিলা। সে সমাবেশে উন্মুক্ত প্রশ্ন উত্তরের ব্যবস্থা থাকতো। মহিলারা খোলামেলা প্রশ্ন করে জেনে নিতেন তাদের জ্ঞাতব্য বিষয়। রসূল স.তাদেরকে দিক নির্দেশনা দিতেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ইসলামী গন্ডির মধ্যে থেকে মহিলাদের সমাবেশ করা বৈধ। এর দ্বারা আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রমাণিত হয় যে, রসূল স. নারী শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। এভাবেই রসূল স. নারীদেরকে দীন শিক্ষা দিতেন।[১৯]

নারীর অর্থনৈতিক অধিকার

অন্যান্য ধর্মমতে নারীদের অর্থনৈতিক কোনই অধিকার ছিল না। বিয়ের পূর্বে নারী থাকত পিতার সম্পদ, আর বিয়ের পর হত স্বামীর সম্পদ। নারীর নিজস্ব কোন সম্পদ থাকলে তাতে স্বামীর মালিকানা সাব্যস্ত হত। ইসলাম নারীদেরকে সম্পদের অধিকার প্রদান করেছে। নারীকে পিতৃ সম্পদে উত্তরাধিকার দিয়েছে। মোহরানার অর্থের সম্পূর্ণ মালিকানা একমাত্র নারীর। এসব সম্পদে কারো হস্তক্ষেপের কোন সুযোগই ইসলাম রাখে নি। নারী এসব সম্পদের একচ্ছত্র মালিক। উপরন্তু স্বামীর দায়িত্ব হচ্ছে– স্ত্রীর ভরণ পোষণের যাবতীয় ব্যবস্থা করা। বলা হয়েছে যে, যদি কোন যুবক ভরন পোষণের সামর্থ না রাখে তবে সে বিবাহ করবে না। পুরুষ কোন মহিলাকে বিয়ে করলে তার ভরণ পোষণ করতে বাধ্য থাকবে এবং যদি কেউ ভরণ পোষণে করতে অক্ষম হয় বা ত্রুটি করে তবে আইনের মাধ্যমে তা আদায় করার পূর্ণ ব্যবস্থা রয়েছে। একজন নারীর নিজস্ব ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প কারখানা, ব্যাংক ব্যালান্স থাকতে পারে। এসব অর্থ ব্যবহার করার অধিকার নারীর জন্য সংরক্ষিত। নারী তার নিজস্ব সম্পদ থেকে দান-খয়রাত খরচাদি নিজের ইচ্ছামত করতে পারবে।[২০]

নারীর রাজনৈতিক অধিকার

গভীরভাবে ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, ইসলামই প্রথম নারীদেরকে রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করেছে। রাজনৈতিক অধিকারের মধ্যে ভোট প্রদান, সরকারী কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ ইত্যাদি যাবতীয় কাজে অংশ গ্রহণ অন্তরভুক্ত। হযরত ওমর রা. এর খিলাফতকালে রাষ্ট্রীয় জরুরী বিষয়ে সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে হযরত সাফা বিনতে আবদুল্লাহর রায়কে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন। খলীফাতুল মুমিনীন হযরত ওমর রা-এর খিলাফতকালে জনৈক মহিলা খলীফার সাথে বিতর্ক করে তার দাবি প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ঘটনাটি নিম্নরূপ হযরত ওমর রা. জুমআর খুৎবায় বিয়ের প্রতি যুবকদেরকে উৎসাহিত করার জন্য মোহরের পরিমাণ কম করার পরামর্শ দেন। এতে একজন মহিলা দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করলেন, খলীফাতুল মুমিনীন, আল্লাহ তাআলা কুরআনে অধিক মালের কথা বলেছেন আর আপনি তা কম করতে বলছেন। এ অধিকার আপনাকে কে দিল? আল্লাহ তাআলা হযরত ওমর রা.কে সত্য গ্রহণের অসামান্য সৎ সাহস দান করেছিলেন। তাই তিনি নির্দ্বিধায় নিজের রায় প্রত্যাহার করে নেন এবং বলেন, এ মহিলার দাবি সঠিক।[২১] হযরত ওমর রা. খলীফা নির্বাচনের সময়ও মহিলাদের রায় গ্রহণ করেন। সুতরাং মহিলাগণও ভোটাধিকার প্রয়োগ করে জন প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারেন। একজন স্বাধীন পুরুষের মতই নারীর রাজনৈতিক মতামত দেয়ার অধিকার আছে।

নারীর চাকরীর অধিকার

নারীদের ব্যাপারে ইসলামের যে সব মৌলিক বিধান রয়েছে তন্মধ্যে অন্যতম হলো, নারী তার নিজস্ব অঙ্গনে থাকবে। স্বামী স্ত্রীর মধ্যকার বন্ধন প্রতিষ্ঠিত ও শক্তিশালী হয় মুখপেক্ষিতার ভিত্তিতে। স্বামী তার সন্তান লালন-পালনের জন্য স্ত্রীর মুখাপেক্ষি আর স্ত্রী তার জীবনোপকরণের ক্ষেত্রে স্বামীর মোহতাজ। স্বামী স্ত্রীর মাঝে এরূপ মুখাপেক্ষিতা যদি কোন অংশে কমে যায় বা একেবারে না থাকে তাহলে পরস্পরের প্রেম-ভালোবাসা, বন্ধন অবশিষ্ট থাকে না।

ইসলাম নারীকে প্রয়োজনের তাগিদে চাকরী করার অনুমতি দিয়েছে। বিশেষ করে যে সব ক্ষেত্রে নারী তার স্বাতন্ত্র অক্ষুণ্ন রাখতে পারবে, যে সব ক্ষেত্রে নারী বেশি অবদান রাখতে পারে সে সব ক্ষেত্রে নারী চাকরী করতে পারবে। যেমন নার্সিং 'শিক্ষকতা' চিকিৎসা, বিচারক ইত্যাদি। প্রাথমিক যুগের মুসলিম মনীষীগণ যেমন হযরত ইমাম আবু হানীফা র. ফৌজদারী আদালত ছাড়া অন্য যে কোনো বিচারের ক্ষেত্রে নারীদেরকে বিচারক নিয়োগ করা দোষণীয় মনে করতেন না। খলীফা হযরত ওমর রা. শিফা বিনতে আবদুল্লাহ নাম্নী মহিলাকে রাজধানী মদীনার বাজার পরিদর্শক নিযুক্ত করেছিলেন।[২২] মোট কথা শরয়ী পর্দার বিধানের মধ্যে অবস্থান করে তারা চাকরি করতে পারবে।

নারীর মর্যাদা 'মা' হিসেবে

নারী মায়ের জাতি, তারা জাতির মা। এ জন্যই ইসলাম মাকে সুমহান মর্যাদা ও সম্মান দিয়েছে। এর নজীর অন্য কোনো ধর্ম ও মতবাদ দিতে অক্ষম। রসূল স. বিভিন্ন

হাদীসের মাধ্যমে মায়ের যে সম্মান বর্ণনা করেছেন– এটি নারীর সম্মানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সোপান।

এ ধরার বুকে মানুষ আগমন করে মা-বাবার মাধ্যমে। মা-বাবই তাদের অকৃত্রিম আদর যত্ন, সোহাগের মাধ্যমে বড় করে তোলে। একটি সন্তানকে গড়ে তুলতে মাতা-পিতার যে কি পরিমাণ কষ্ট হয় তা কেবল পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে তারাই সক্ষম যারা মাতা-পিতার আসনে সমাসীন হয়েছেন। আজকের উন্নত বিশ্বে যখন বৃদ্ধ মা-বাবাকে এতীম খানার আদলে গড়ে তোলা বৃদ্ধ সদনে রাখা হয় আর অপেক্ষা করা হয় তাদের বিদায় সংবাদের সে ক্ষেত্রে মানবতার মুক্তির দূত রসূলে আরাবী স.-এর দরবারে জনৈক ব্যক্তি এসে আরয করল ইয়া রসূলাল্লাহ! সন্তানের উপর মাতাপিতার কি অধিকার রয়েছে ? রসূল স. প্রত্যুত্তরে বললেন, তারাই তোমার বেহেশত আর তারাই তোমার দোযখ।[২৩]

একদিন রসূল স. এর দরবারে জনৈক ব্যক্তি এসে আরয করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ, আমি আল্লাহর পথে জিহাদ করতে চাই। যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার জন্য বাড়ী থেকে তৈরি হয়ে এসেছি। রসূল স. তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মা কি জীবিত আছেন ? সে বলল, হ্যাঁ আমার মা জীবিত। রসূল স. তাকে বললেন, তুমি তার সেবায় লেগে থাক। নিশ্চয় বেহেশত তার পায়ের কাছেই আছে।

একবার রসূল স. এর নিকট জনৈক সাহাবা এসে আরয করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ স. আমার নিকট সর্বোত্তম আচরণ পাওয়ার হকদার কে? নবীজী স. বললেন– তোমার মা, সে বলল তারপরে ? নবীজী বললেন, তোমার মা, সে বলল তার পরে? নবীজী স. বললেন তোমার মা। অন্য এক হাদীসে এসেছে, নবীজী স.কে চতুর্থবার প্রশ্ন করার পরে উত্তর দিলেন তোমার বাবা।[২৪]

মায়ের আনুগত্য

ইসলাম মায়ের খোরপোষের ব্যবস্থা করাকে ওয়াজিব করে নি বরং মাতা-পিতার শরীয়ত সম্মত আদেশ পালন করাকে ওয়াজিব করে দিয়েছে। তবে মা বাপ যদি শরীয়ত বিরোধী কোন আদেশ করে তাহলে সে আদেশ মান্য করা ওয়াজিব নয়। বরং তা বুদ্ধিমত্তার সাথে এড়িয়ে যাওয়া ওয়াজিব।

হযরত ইবনে ওমর রা. বলেন, আমার স্ত্রীকে আমি খুব ভালোবাসতাম, কিন্তু (আমার পিতা) হযরত ওমর তাকে অপছন্দ করতেন। তিনি একবার আমাকে বললেন, তুমি একে তালাক দিয়ে দাও! আমি অস্বীকার করলাম। তারপর তিনি গিয়ে রসূল স.কে জানালেন। রসূল স. তাকে তালাক দিয়ে দিতে বললেন।[২৫]

এ ছাড়া আরো বলা হয়েছে, মায়ের জীবদ্দশায় যদি পুত্রের মৃত্যু হয় তাহলে তার পরিত্যক্ত সম্পদে ছেলে মেয়ে স্ত্রীর ন্যায় মাও অংশীদার হবে। সে ক্ষেত্রে মা মৌলিক অংশীদার হবে। মোট কথা ইসলাম মাকে যে পরিমাণ সম্মান মর্যাদা দান করেছে তা আর কোনো দর্শন বা মতবাদ দিতে সক্ষম হয় নি। অধিকন্তু রসূল স, ও সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন মায়ের অধিকার মর্যাদা ও যত্নের প্রতি।

নারীর অধিকার স্ত্রী হিসেবে

রসূল স. স্ত্রীর প্রতি উত্তম আচরণ ও হৃদ্যতা প্রদর্শনের যতটা তাকীদ ও গুরুত্বারোপ করেছেন এর নজীর পৃথিবীর অন্য কোনো ধর্ম বা দর্শনে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

জীবনের সন্ধ্যাকাল পর্যন্ত তিনি স্ত্রীর সাথে উত্তম আচরণের উপদেশ দিয়ে গেছেন। তিনি বিদায় হজ্জের ভাষণে এবং অন্তিম অসুস্থতার সময়েও এদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

রসূল স. স্পষ্ট ভাষায় ইরশাদ করেন, পূর্ণাঙ্গ মু'মিন সেই যার চরিত্র সুন্দর, আর চারিত্রিকভাবে তোমাদের মধ্যে তারাই উত্তম যারা তাদের স্ত্রীদের দৃষ্টিতে উত্তম।[২৬]

রসূল স. বিদায় হজ্বের ঐতিহাসিক ভাষণে বলেছেন, তোমরা স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহকে অবশ্যই ভয় করে চলবে। তোমাদের মনে রাখতে হবে যে তোমরা তাদের গ্রহণ করেছো এবং তোমরা তাদের উপভোগ করছো।

রসূল স. ঘোষণা করেন, নারীরা হলো পুরুষদের উত্তম সাথী।

বিশ্বনবী স. দ্বিধাহীন চিত্তে বলেছেন, বিশ্বময় বহু অমূল্য সম্পদ রয়েছে তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হচ্ছে ধর্মপরায়ণা স্ত্রী।

ইসলাম স্ত্রীকে মোহর প্রদান করা বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে। ইসলাম স্ত্রীদেরকে প্রহার, গালি-গালাজ ইত্যাদি কষ্টদায়ক বিষয় মোটেও পছন্দ করে না। তাই বিশ্বনবী স. ইরশাদ করেন, তোমরা স্ত্রীদেরকে প্রহার করবে না, মুখমণ্ডলে আঘাত করবে না, তাদের মুখের শ্রী নষ্ট করবে না। অকথ্য ভাষায় তাদের গালি গালাজ করবে না এবং নিজের ঘরছাড়া অন্য কোথাও তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে রাখবে না।

স্ত্রীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব স্বামীর জন্য বাধ্যতামূলক। স্ত্রীর খাবার দাবারের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ স্বামীকেই করতে হবে। এ সম্পর্কে নবী স. ইরশাদ করেন, যখন তুমি যা খাও স্ত্রীকেও তাই খেতে দিবে। আর নিজের জন্য যে মানের পোষাক পরিচ্ছদ পছন্দ কর অনুরূপ মূল্যের বা মানের পোষাক স্ত্রীকেও প্রদান করবে।[২৭]

রসূল স. আরো বলেছেন, স্ত্রীদের খাবার ও পরার ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে তোমরা অবশ্যই তাদের মান সম্মানের দিকে লক্ষ্য রাখবে এবং উত্তম আচরণ করবে।

ইসলাম অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্ত্রীদের এত অধিকার দিয়েছে যে স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্ত্রী স্বামীর সম্পদ থেকে দান-সদকা করতে পারবে। রসূল স. বলেছেন, স্ত্রী স্বামীর আদেশ, অনুমতি ছাড়াই যা কিছু ব্যয় করবে তার অর্ধেক সওয়াব স্বামীকে দেয়া হবে।

দাম্পত্য জীবন সুখি ও সুন্দর এবং আবেগময় হওয়ার জন্যও ইসলাম স্বামী স্ত্রীর মধ্যে উপহার উপঢৌকন আদান-প্রদান করার আদেশ করেছে। তাই বিশ্বনবী স. ইরশাদ করেন, তোমরা পরস্পর হাদীয়া তোহফা (উপহার উপঢৌকন) আদান প্রদান করবে। কারণ তোহফা দিলে ক্লেদ হিংসা ও দ্বেষ (অন্তর থেকে) দূর হয়ে যায়।

নারীর প্রতি উত্তম আচরণের নির্দেশ

কুরআন হাদীসে স্ত্রীদের সাথে উত্তম আচরণের কথা বিস্ময়কর ভঙ্গিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে, 'তাদের সাথে উত্তম রূপে জীবন-যাপন কর।'[২৮]

আরবী মারুফ শব্দের অর্থই হচ্ছে প্রচলিত নিয়ম পদ্ধতি। এতে স্ত্রীর সাথে সর্বপ্রকার উত্তম আচরণ উপাদেয় খানা-পিনা, লেবাস-পোষাক, কথা-বার্তা, স্ত্রীর আত্মীয় স্বজনদের সাথে উত্তম ব্যবহার, তাদের আবেগ অনুভূতি রক্ষা করাসহ সকল প্রকার উত্তম আচরণের কথা বলা হয়েছে। ফিকাহবিদগণ এর ভিত্তিতেই নারীর যাবতীয় অধিকার নির্ধারণ ও নিশ্চিত করেছেন। স্ত্রীদের সেবিকার ব্যবস্থাও স্বামীকে করতে বলা হয়েছে। অবশ্য স্বামী যদি সামর্থবান হয়। হযরত ইমাম আবু হানীফা র. দুজন খাদেম আবশ্যক বলেছেন। একজন ঘরোয়া কাজে আরেক জন বাইরের কাজের জন্য। সর্বোপরি স্বয়ং রসূল স. হযরত আয়শা রা.কে বলেন, তুমি কখন আমার প্রতি সন্তুষ্ট আর কখন আমার প্রতি অসন্তুষ্ট থাক আমি তা টের পেয়ে যাই। আর তা এভাবে যে, তুমি যখন আমার প্রতি অসন্তুষ্ট থাক তখন ইবরাহীমের রবের নামে কসম খাও আর সন্তুষ্ট থাকলে মুহাম্মদের রবের নামে কসম খাও। একথা শুনে হযরত আয়শা রা. হেসে বললেন, শুধু মুখেই নামটা বর্জন করে থাকি কিন্তু বাস্তবে ঠিক আপনার প্রতি ভালোবাসা থাকে। এ ঘটনা থেকেই প্রতিভাত হয় যে হুজুর স. এর সাথে তার জীবন সঙ্গীনীদের সম্পর্ক কত আন্তরিক ও প্রাণবন্ত ছিল।

এখানে চিন্তার বিষয় হচ্ছে রসূল স. নবুওয়াতের সর্বোচ্চ আসনে সমাসীন ছিলেন। সেই সাথে ছিলেন শাসনকর্তা। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত নিয়মিত তাঁর দরবারে আসতো। বিভিন্ন মামলার রায় তাঁকেই দিতে হত। বাইতুল মাল থেকে কর্মচারীদের বেতন, ভাতা, গনীমতের মাল বণ্টন তিনি নিজ হাতেই করতেন। মানুষকে ওয়াজ নসীহত তিনিই করতেন। কারণ তিনিই তো মানবতার মহান শিক্ষক। কুরআনে বলা হয়েছে, 'তিনি মানুষকে কিতাব ও হিকমাহ শিক্ষা দেন।'

এদিকে ওহীর বরাত নিয়ে অবতীর্ণ হন হযরত জিবরাঈল আ.। কুরআনের আয়াত লেখানো ও বিন্যস্ত করার কাজও চলছে। কখনো জিহাদে ছুটে যাচ্ছেন। কিন্তু এত ব্যস্ত তা সত্ত্বেও পারিবারিক ও ঘরোয়া জীবনে তিনি একজন হৃদয়বান স্বামী। প্রতিদিন আসর নামাযের পর জীবন-সঙ্গীনীদের ঘরে ঘরে যাচ্ছেন। তাদের খোঁজ খবর নিচ্ছেন। তাদের কাজকর্মে সাহায্য করছেন। যার পালা থাকত তার ঘরে মাগরিব থেকে এশা পর্যন্ত থাকতেন। স্ত্রীরা সবাই এসে উপস্থিত হতেন। পরামর্শ আলোচনা, উপদেশ অব্যহত থাকত।

হযরত আয়শা রা. যখন রসূলে আরাবীর হারেমে আগমণ করেন তখন তাঁর বয়স ছিল খুবই কম। তিনি আয়েশার কম বয়সের প্রতি খেয়াল রাখতেন। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তাঁকে হাবশী বালকদের খেলা দেখাতেন। ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থেকে খেলা দেখার সুয়োগ করে দিতেন।

স্ত্রীকে সোনার গয়নায় ভরিয়ে দেয়া বিত্তবানদের জন্য খুব সহজ ব্যাপার। কিন্তু বাইরের জীবনের শত ব্যস্ততা ও ঝঞ্ঝাট সত্ত্বেও পরিবারের লোকদের চাওয়া পাওয়া অনুভূতির প্রতি পূর্ণ যত্ন নেয়া তাদের খোঁজ খবর নেয়া ও মেজাজ রক্ষা করা কোন সহজ বিষয় নয়। সত্যিই উত্তমরূপে জীবন-যাপন অতি উঁচু চরিত্রের দলীল যা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। এর জন্য হৃদয়ের বিশালতা প্রয়োজন।

নারীর উত্তরাধিকার স্বত্ব

ইসলাম নারীকে উত্তরাধিকারের দিক থেকেও সম্মানিত করেছে। নারী পিতৃ সম্পদ ও স্বামীর সম্পদ উভয় ক্ষেত্রে অংশীদার হয় নির্দিষ্ট পরিমাণে। এর কোন একটা অধিকার হরণ করার ক্ষমতা কারো নেই। আর এ অধিকার সার্বক্ষণিক, সাময়িক নয়। দুর্ভাগ্যক্রমে যদি কোন নারীর বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে যায় আর তার সন্তান থাকে তবে সেই সন্তান লালন পালনের ক্ষেত্রে ইসলাম যে বিধান প্রবর্তন করেছে তাও সত্যিই অবিস্মরণীয়। কারণ সেখানেও নারীর প্রতি অধিক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। ছোট সন্তান থাকলে তার প্রতি মায়ের মায়া মমতা থাকে বেশি সে দিকেই লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, সন্তান লালন পালন করবে স্ত্রী আর তার খরচ বহন করবে স্বামী। মেয়ে সন্তানের লালনপালনের মেয়াদ হচ্ছে সাবালিকা হওয়া পর্যন্ত আর ছেলে সন্তান হলে তার লালন পালনের সীমা হচ্ছে সাধারণত ৭/৮ বছর। শিক্ষা দীক্ষার বয়স হলে পিতার নিকট গিয়ে লেখাপড়া শিক্ষা নিবে। তবে এর পরেও মায়ের সাথে দেখা সাক্ষাত করার অনুমতি থাকবে। আবার মা যখন তখন বাচ্চাকে দেখতে ইচ্ছে করলে দেখতে পারবে। এ ব্যাপারে কোন বাধা নিষেধ থাকতে পারবে না।

একাধিক বিয়ের অনুমতি

সামরিক শাসক আইউব খান ইসলাম বিরোধী যে কয়টি আইন জারী করেছিলেন তন্মধ্যে একটি হল 'মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১'। এর মধ্যে ৬ নং ধারাটি বহু বিবাহ সম্পর্কিত। ৬ নং ধারার ১ নং উপধারায় বলা হয়েছে, ... পরিষদের লিখিত পূর্ব অনুমতি ছাড়া কোন ব্যক্তি একটি বিবাহ বলবৎ থাকলে আরেকটি বিবাহ করতে পারবে না। এবং বর্তমান স্ত্রীর পূর্ব অনুমতি গ্রহণ না করে এই জাতীয় কোন বিবাহ হলে তা মুসলিম বিবাহ ও তালাক (রেজিস্ট্রেশন) আইন ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ২ নং আইন) অনুসারে রেজিস্ট্রি হবে না।

এ আইনটি সম্পূর্ণ কুরআন হাদীস বিরোধী। কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক। কুরআন বলছে, 'আর যদি তোমরা ভয় কর যে এতীম মেয়েদের হক যথাযথভাবে পূরণ করতে পারবে না, তবে সে সব মেয়েদের মধ্য থেকে যাদের ভালো লাগে, তাদের বিয়ে করে নাও দুই, তিন, কিংবা চারটি পর্যন্ত। আর যদি এরূপ আশংকা কর যে তাদের সাথে ন্যায় সঙ্গত আচরণ বজায় রাখতে পারবে না, তবে একটিই'।[২৯] একাধিক বিবাহ ইসলাম পূর্বযুগেও দুনিয়ার প্রায় সব ধর্মেই বৈধ বলে বিবেচিত হত। আরব আজম সর্বত্রই এই প্রথার প্রচলন ছিল। বহু বিবাহের প্রয়োজনীয়তার কথা বর্তমান যুগেও স্বীকৃত। বর্তমানে এক শ্রেণীর চিন্তাবিদ বহু বিবাহ রহিত করার জন্য তাদের অনুসারীদেরকে উদ্বুদ্ধ করে

আসছেন। কিন্তু এতে সমস্যা আরো প্রকট হয়েছে এবং বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগামিতা। বর্তমানে পাশ্চাত্যের দূরদর্শী চিন্তাশীল ব্যক্তিরা বহু-বিবাহের।

ইসলাম পূর্বযুগে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন ধর্ম এবং দেশের ইতিহাস থেকে এটা জানা যায় যে, এতে কোনো প্রকার বাধা-নিষেধ ছিল না। ইহুদী, খৃষ্টান, আর্য, হিন্দু এবং পারসিকদের মধ্যে বহু-বিবাহের প্রচলন ছিল। ইসলামের প্রাথমিক যুগেও কোন সংখ্যা নির্ধারণ ছাড়াই এই ব্যবস্থা চালু ছিল। তবে তৎকালে সীমা-সংখ্যাহীন বহু-বিবাহের জন্য অনেকের লোভ-লালসার অন্ত ছিল না। অন্য দিকে এ থেকে উদ্ভূত দায়িত্বের ক্ষেত্রেও তারা সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারত না; বরং এসব স্ত্রীকে তারা রাখত দাসী-বাঁদীর মতো এবং তাদের সাথে যথেচ্ছ ব্যবহার করত, পরস্পরের সম্পর্কের মধ্যে বিরাজ করত চরম বৈষম্য।

কুরআন এই সামাজিক অনাচার ও জুলুম প্রতিরোধ করেছে। বহু বিবাহের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় বিধি নিষেধ জারি করেছে। ইসলাম একই সময়ে চার-এর অধিক স্ত্রী রাখাকে হারাম ঘোষণা করেছে। ইসলাম এক্ষেত্রে ইনসাফ কায়েমের জন্য বিশেষ তাকিদ দিয়েছে এবং ইনসাফের পরিবর্তে জুলুম করা হলে তার জন্য শাস্তির কথা ঘোষণা করেছে। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, 'তোমাদের পছন্দমত দুই তিন অথবা চারজন স্ত্রী গ্রহণ করতে পার। তবে শর্ত সাপেক্ষে। একাধিক বিবাহ পুরুষের জন্য একটি আল্লাহ প্রদত্ত মৌলিক অধিকার। একাধিক স্ত্রীর ভরণ-পোষণ থাকা-খাওয়া তথা সার্বিক চাহিদা যদি কোন পুরুষ পূরণ করতে পারে তবেই সে একাধিক বিয়ে করতে পারবে। আর যদি সার্বিক চাহিদা পূরণে অক্ষম হয় তবে সে একাধিক বিবাহ করতে পারবে না।

তালাকের অধিকার স্বামীর

ইসলামের যে সমস্ত বিষয় নিয়ে নাস্তিক ও বিরুদ্ধবাদীরা সংশয়ে ভোগে তার মধ্যে একটা হলো ইসলাম তালাকের একচেটিয়া অধিকার দিয়েছে পুরুষকে। তারা মনে করে এতে পুরুষের হাতে একচেটিয়া ক্ষমতা থাকে আর নারীরা সর্বদা তালাক আতংকে ভোগে। কোষমুক্ত কৃপানের মত তাদের ললাটের সামনে থাকে তালাকের হুংকার। কিন্তু বিষয়টি যদি গভীরভাবে চিন্তা করা হয় তবে যে কথাটা প্রতিভাত হয়ে ওঠে তা হল, তালাক সামাজিক একটি প্রয়োজন। এতে নারীর স্বাধীনতা ও ইজ্জত রক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে।

অবশ্য ইসলাম স্বামীকে তালাকের অধিকার দিয়েছে তবে এটা কোনো মামুলী ব্যাপার নয়। স্বামী স্ত্রীর মাঝের বিরোধ কোন অবস্থাতেই নিষ্পত্তি সম্ভব না হলে শেষ প্রতিকার হিসাবে তালাকের অনুমতি দেয়া হয়েছে। এ কারণেই রসূল স. ইরশাদ করেন, 'বৈধ বিষয়াবলীর মধ্যে সর্বাধিক নিকৃষ্ট হলো তালাক।'[৩০] এ ছাড়া তিনি আরো বলেন, 'যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দেয় তখন আল্লাহর আরশের স্তম্ভগুলো কেঁপে ওঠে।'[৩১] তাছাড়া কুরআনুল কারীমে তালাক দেয়ার কিছু পদ্ধতি বলে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে স্ত্রীদের উপদেশ দাও। অর্থাৎ বুঝিয়ে সুজিয়ে সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা কর। যদি এতে কোনো ফায়দা না হয় তবে সাময়িকভাবে তাদের বিছানা আলাদা করে দাও। বিছানা

আলাদা করার ব্যাপারে কিছু নিয়ম মেনে চলা জরুরী। বিছানা আলাদা করতে গিয়ে তাকে নিজ ঘরের বাইরে অন্য কোথাও রাখবে না বরং ঘরের মধ্যে তার বিছানা আলাদা করবে। কারণ নিজ ঘরের বাইরে বা অন্য কারো ঘরে রাখলে অঘটন ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। এ ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হলো স্ত্রীকে একথা বুঝানো যে, স্বামীর সাথে অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি করলে অবস্থা বিপরীত দিকে ঘুরে যেতে পারে। আর এতেও যদি স্ত্রী ঠিক না হয় তবে 'কিছু মারধর করার অনুমতিও রয়েছে। তবে মারধর করার সীমা শরীয়ত নির্ধারিত। তাকে সামান্য প্রহার করা। কোন কোন ফিকাহবিদ লিখেছেন স্ত্রীকে প্রহারের উদ্দেশ্য হলো মেছওয়াক দিয়ে প্রহার করা। এতে স্ত্রীর বিবেকে আঘাত হানবে। আর কারো বিবেকে আঘাত হানলে সে খুব তাড়াতাড়ি ঠিক হতে পারে। এরপরেও যদি স্ত্রী সোজা পথে না আসে তবেই কেবল তালাক দেয়ার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। তালাক বিস্তারিত আলোচনা সাপেক্ষ বিষয় এ সংক্ষিপ্ত পরিসরে তা সম্ভব নয়।

নারীর বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার

অকর্মণ্য, দুশ্চরিত্র ও অত্যাচারী স্বামীর জিঞ্জির থেকে মুক্তি পাওয়ার ব্যবস্থা ইসলাম রেখেছে। এ জন্য 'খুলা' তালাকের অনুমতি আছে। স্ত্রীর যদি স্বামীর সাথে থাকার মতো কোন অবস্থা বাকী না থাকে এবং স্বামী স্ত্রীকে তালাকও না দেয় এ ক্ষেত্রে ইসলাম সুযোগ দিয়েছে যে স্ত্রী-স্বামীকে কিছু টাকা দিয়ে নিজেকে মুক্ত করে নিবে। তালাক নিয়ে নিবে। কিন্তু ইসলাম তালাক ব্যবস্থাকে নিকৃষ্ট কাজ মনে করে। আল্লাহ তাআলা বলেন, যদি তাদের ভয়ের আশংকা হয় যে তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করতে পারবে না তবে স্ত্রী কোন কিছুর বিনিময়ে নিস্কৃতি পেতে চাইলে তাতে তাদের কোন অপরাধ নেই।[৩২]

তালাকের মাধ্যমে মূলত নারীর জীবন মর্যাদা রক্ষারই ব্যবস্থা করা হয়েছে। কারণ সকলেরই জানা আছে, বৈধ অবৈধ অনেক কারণেই স্বামী স্ত্রীর প্রতি ক্ষুব্ধ ও নিরাসক্ত হয়ে উঠতে পারে। মনে প্রাণে যখন তাকে ঘৃণা করতে শুরু করে তখন স্ত্রী স্বামীর বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে চায়। যদি মুক্তির কোন বৈধ পথ না থাকে তাহলে সে মানসিক জ্বালা থেকে রক্ষা পাবার জন্য অবৈধ কোন পন্থা অবলম্বন করে। নয়তো স্ত্রী নিজের জীবনহানি ঘটাতে চায়। এ ধরনের সংকট কালে তালাক হয়ে পড়ে মুক্তির পথ, বাঁচার উপায়। হিন্দু সমাজের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, নারীদের পুড়িয়ে মারা, হত্যা করার ঘটনা বিপুল। এক জরিপে দেখা গেছে, ভারতে প্রতি ২ ঘন্টায় একজন করে বধুকে পুড়িয়ে মারা হয়। পক্ষান্তরে মুসলমানদের মধ্যে স্ত্রী হত্যা অনেক কম। কারণ মুসলমানদের মধ্যে তালাকের ব্যবস্থা আছে।

অনুরূপভাবে তালাক নারীর ইজ্জত সম্মানেরও রক্ষা কবচ। আমাদের দেশে তালাকের যতো মামলা হয়েছে স্বামীকে তালাকের যথার্থ কারণ দর্শাতে হয়েছে। আর স্বামী আসামীর কাঠগড়ায় দাড়িয়ে যখন স্ত্রীর গোপন দোষ সমূহ বর্ণনা শুরু করে তাতে স্ত্রীর সততা ও পবিত্রতা ক্ষুণ্ন হয়, সমাজে সে লাঞ্ছিত ও মর্যাদাহীন হয়ে যায়। এ কারণেই

ইসলাম নারীর অধিকার, মান-সম্মান রক্ষা করে ইজ্জতের সাথে তালাক দিয়ে আদালতে উঠে লাঞ্ছিতা হওয়া থেকে রক্ষা করেছে। হিন্দু ধর্মে তালাকের ব্যবস্থা নেই। তাই সেখানে বিবাহিত জীবন যত কঠিন ও রক্ত স্নাত হোক না কেন তাই বহন করে চলতে হয়। পক্ষান্তরে শান্তির ধর্ম ইসলামে বিয়ে নামের সোনার মালা যখন লোহার শেকল হয়ে দাঁড়ায় তখন সে শেকল ভাঙ্গার রহমত হয়ে ওঠে 'তালাক'। সকল দেশের বিজ্ঞান মনস্ক মানুষ ইসলামের এ আইনকে যথার্থ বলেছে।

সামরিক অভিযানে নারী

জিহাদ ইসলামের অন্যতম ইবাদত। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মহিলাগণ যখন শুনতে পেলেন আল্লাহর পথে শাহাদাত লাভকারীর মর্যাদা অনেক বড়। তখন তারাও জিহাদে অংশগ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। রসূলুল্লাহ স. এর যুগে মেয়েরা সামরিক অভিযানে অংশ গ্রহণ করতেন। তারা যোদ্ধাদের পানি পান করানো, আহতদের সেবা শুশ্রূষা করা, খাদ্য তৈরি ও চিকিৎসার কাজে নিয়োজিত থাকতেন। প্রয়োজনে মহিলাগণ অস্ত্র হাতে নিয়ে যুদ্ধও করেছেন। তাদের মধ্যে উম্মে আম্মারা নাসীরা রা. অন্যতম। তিনি ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের দুরবস্থা এবং রসূলুল্লাহ সা.কে আহত দেখে একজন সাহাবীর পরিত্যক্ত তলোয়ার নিয়ে শত্রুর প্রতি আক্রমণ করেন। রসূল স. বলেন, ডানে ও বামে যে দিকেই তাকাচ্ছিলাম সে দিকেই দেখছিলাম উম্মে আম্মারা আমাকে রক্ষার জন্য প্রাণপণে লড়াই করছিল। ওহুদ যুদ্ধে উম্মে সালীম উম্মে সালীত, রাবী বিনতে মাউয উম্মে আতিয়া রা. এরা সকলেই যোদ্ধাদের সাহায্যের জন্য যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। হুনাইনের যুদ্ধে উম্মে সালীতের হাতে একখানা তলোয়ার দেখে রসূল স. তাকে বললেন, তলোয়ার দিয়ে কী করবে ? উত্তরে তিনি বললেন, তলোয়ার এ জন্য নিয়েছি যে, আমার নিকট দিয়ে কোন মুশরিককে যেতে দেখলে তার পেটে ঢুকিয়ে দিব। তার কথা শুনে রসূল স. হেসে ফেললেন।[৩৩]

আমরা দেখতে পাই রসূল স. এর যুগে নারীরা সকল প্রকার অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করেছেন। রসূল স. প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থা ও সামাজিক বিধান আমাদের জন্য চিরন্তন মডেল। চৌদ্দশ বছরের পথ পরিক্রমায় আমরা তা থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু বর্তমানে পাশ্চাত্যের দেশগুলো নারীর সমান অধিকার ও স্বাধীনতার নামে যা করছে তা নারীত্বের চরম অবমাননা এবং নারীকে এক অসম যুদ্ধে লিপ্ত করা ছাড়া আর কিছুই নয়।।

আমেরিকার সমাজ ব্যবস্থা নৈতিক চরিত্র ও মানবিক মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলেছে। ১৯৬০ সালে আমেরিকায় ২ লক্ষ ৪০ হাজার শিশু জন্মগ্রহণ করে অবিবাহিত মেয়েদের গর্ভে। ১৯৮৩ সালে সে সংখ্যা দাড়ায় ৪৩ লাখে। ১৯৯৩ সালে ৬৩ লাখে, ১৯৭৭ সালের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় আমেরিকা ও ব্রিটেনে প্রতি ৩টি শিশুর মধ্যে একটি কুমারি মাতার সন্তান। এই অবৈধ সন্তানদের লালন পালনের জন্য আমেরিকা সরকার প্রতি বছর ৮০ কোটি ডলার ব্যয় করে। ১৯৮০ সালে বিলেতে ১০ হাজার অবিবাহিত মেয়ের উপর

জরিপ চালিয়ে মাত্র ১টি কুমারি মেয়ে পাওয়া গেছে। ওসব দেশে জোর পূর্বক ধর্ষণের সংখ্যাও দিন দিন বেড়ে চলেছে। ১৯৮২ সালে আমেরিকায় বল পূর্বক ধর্ষণের সংখ্যা ছিল ৭৯ হাজার। ১৯৯১ সালে তার সংখ্যা দাড়ায় ১ লাখ ৭ হাজারে। বর্তমান সেখানে প্রতি ৫ মিনিটে একটি করে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। সে সব দেশে অবিবাহিত মেয়েদের গর্ভধারণ, অবৈধ সন্তান, গর্ভপাত, তালাক, যৌন অপরাধ ও এইডসের মত ধ্বংসাত্মক ব্যাধি মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। প্রতি ৮ সেকেন্ডে ১ জন নারী নির্যাতিত হচ্ছে আর প্রতি ৬ মিনিটে একজন ধর্ষিত হচ্ছে।

১৯৯৫ সালের ৪ সেপ্টেম্বর বেইজিং সম্মেলনে বিশ্বের ১৮৫টি দেশের ১০ হাজার সরকারী প্রতিনিধি, ২০ হাজার বেসরকারী প্রতিনিধিসহ প্রায় ৩০ হাজার প্রতিনিধি অংশ নেয়। সে সম্মেলনে নারী অধিকার নিয়ে আলোচনা হয়। ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার পর থেকে অদ্যাবধি নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলছে। ১৯৪৬ সালে জাতিসংঘ গঠন করেছিল নারীর মর্যাদা বিষয়ক কমিশন। ১৯৫২ সালে নারীর রাজনৈতিক অধিকার সনদ। ১৯৭৫ সালে আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ ঘোষণা, ১৯৭৬-৮৫ সালকে নারী দশক ঘোষণা, ১৯৭৮ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ (সিডা) অনুমোদন। ১৯৮৪ সালে ৭ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস ঘোষণা, ১৯৭৫ সালে কেনিয়ার নাইরোবিতে অনুষ্ঠিত হয় তৃতীয় বিশ্বনারী সম্মেলন। এর লক্ষ্য ছিল সমতা, উন্নয়ন শান্তি।

পশ্চিমা জগৎ নারীদের সমানাধিকার দেয়ার কথা বলে অথচ বাস্তবতা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। আজ পাশ্চাত্যে সরকারী উচ্চপদ রাজনৈতিক ও পার্লামেন্টের সদস্য হিসাবে নারীর মর্যাদা হতাশাব্যাঞ্জক।

এক হিসাব মতে নরওয়েতে শতকরা ৩৫.৭, সুইডেনে ৩৩.৮, জার্মানীতে ২০.৫, স্পেনে ১৪.৬, ইটালিতে ৮.০১, আমেরিকায় ৬.৪ এবং ফ্রান্সে ৫.৭ জন নারী সরকারী উচ্চ পদে চাকুরীতে আছে।[৩৪]

এখন প্রশ্ন হলো এতো কিছু করেও নারী মুক্তি আন্দোলনের প্রবর্তকরা নারীকে মর্যাদা ও অধিকার দিতে পারে নি কেন? তারা নীতি নৈতিকতা, নারী পুরুষের দাম্পত্য প্রেম ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং পারিবারিক সুষমা ও শান্তি বিসর্জন দিয়ে নারী স্বাধীনতার নামে নারীকে পুরুষের ভূমিকায় অবতীর্ণ করেছে। সেখানে বর্তমানে স্ত্রী হওয়া সমাজে অপমানকর। পুরুষের মত কাজ করাকে তারা সম্মানজনক মনে করে, অথচ সন্তান লালন পালনকে ঘৃণা করে।

ইসলাম নারী পুরুষকে স্ব স্ব স্থানে রেখে উভয়কে সমান সুযোগ দিয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে উভয়ই মানবতার অংশ এবং সমাজ গঠনে উভয়ে সমান অংশীদার। নিজ সীমানায় থেকে প্রত্যেকেই জাতি গঠনে কাজ করে সফলতা অর্জন করতে পারে। নারী জাতির এ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য মহানবী স. কে সংগ্রাম করতে হয়েছে। তখনকার সমাজ ব্যবস্থা ও ধ্যান ধারণা পরিবর্তন করে তিনিই প্রথম নারীর যথাযথ অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। রসূল স. প্রচলিত ব্যবস্থায়ই নারীজাতির একমাত্র মুক্তি এ কথা আমরা **যত দ্রুত বুঝতে সক্ষম হবো ততই আমাদের মঙ্গল।**

গ্রন্থপঞ্জি

১. আল ইসলাম আল মারাআত ফিল ইসলাম, সাইয়েদ আফগানী, ১৮ পৃঃ
২. হুকুক আন নিসা ফিল ইসলাম, মুহাম্মদ রশীদ রেজা, ৬২ পৃঃ
৩ লেবাস আল মারাআত, শাহিদা জুমাইলী, ২৫ পৃঃ
৪. তমুদ্দুন-ই হিন্দ ২৩৬ পৃঃ
৫ মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো, সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ., ৬২ পৃঃ
৬. হকুক আন নিসা ফিল ইসলাম, মুহাম্মদ রশীদ রেজা, ১৮ পৃঃ
৭. দয়ানন্দ স্বরস্বতী, ৩৪৪ পৃঃ ও মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো, সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ., ৫৮ পৃঃ
৮. ইসলামী সমাজে নারী' সাইয়েদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, ২৩ পৃঃ
৯. রূহ আদ-দীন আল ইসলামী, আফীফ আব্দুল ফাত্তাহ তাব্বাহ ৩৫৭ পৃঃ
১০. A short History of the world, vol viii, Page : 84 এবং মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো, সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ., ৪৯ পৃঃ
১১. তারীখে তবারী ৩য় খণ্ড ১৩৮ পৃঃ
১২. সাসানী আমলে ইরান, ৪৩০ পৃঃ ও মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো পৃঃ ৫০
১৩. তারীখে তাবারী ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮৮
১৪. V.V kant কিস্‌সাতুল হামরার চীন সভ্যতা শীর্ষক অধ্যায়, ২৮৩ পৃঃ
১৫. আল কুরআন, সূরা- নিসা আয়াত- ৩৪
১৬. আল কুরআন, সূরা নিসা আয়াত- ১
১৭. প্রাগুক্ত
১৮. আল কুরআন সূরা নিসা, আয়াত-১২৪
১৯. বুখারী শরীফ, কুরআন সুন্নাহকে আকড়ে ধরা অধ্যায়- ১৫/৩৭৩
২০. ইসলামের আহবান, খুরশীদ আহমদ, ২০৭ পৃঃ
২১. বিদায়া নিহায়া, হাফেজ ইবনে কাসীর, ৭/১৩৫ পৃঃ
২২. রসূল স. এর যুগে নারী স্বাধীনতা আ. হালীম আবু শুক্কাহ, ১১২ পৃঃ
২৩. ইবনে মাজাহ, মাআরিফুল হাদীস ৬/৪২ পৃঃ
২৪. বুখারী মুসলিম, মাআরিফুল হাদীস ৬/৫১ পৃঃ
২৫. তিরমিযী শরীফ
২৬. মিশকাত শরীফ ২/২৮১ পৃঃ রিয়াদুল সালেহীন ১১৪ পৃঃ
২৭. মিশকাত শরীফ ২/২৬৭ পৃঃ
২৮. আল কুরআন সূরা নিসা আয়াত- ৫
২৯. আল কুরআন সূরা আল ইমরান আয়াত- ১৬৪
৩০. বুখারী মুসলিম মিশকাত ২/২৮০ পৃঃ
৩১. তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন (বাংলা) ২৩০ পৃঃ
৩২. আল কুরআন সূরা নিসা আয়াত- ৩৪
৩৩. তারগীব আত তাহযীব ২/৭০০ পৃঃ
৩৪. The Time, August 1994
* Statistical Abstract of U.S. 1993
* The National Data Book
* ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত জাতি সংঘের ইউ. এস. আই. সি. ও আর আই প্রকাশিত রিপোর্ট
* দৈনিক জনতা ৯৯ সংখ্যা, ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫
* News letter vol. 17 August 1995
* মাসিক মদীনা সেপ্টেম্বর- ১৯৯৭
* মাসিক মদীনা মে- ২০০৪

ইসলামে মেহনতি পশুর অধিকার

অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান

ইসলাম শুধুমাত্র শ্রমজীবী মানুষের অধিকারের কথা বলে শেষ করেনি বরং ইসলামী বিধান আল্লাহর সকল সৃষ্টজীবের উপর প্রযোজ্য। পশু মানুষের মতই জীবনের অধিকারী। তাদের খাদ্য প্রয়োজন, সুখ-শান্তি প্রয়োজন অর্থাৎ জীবন ধারনের জন্য সবই প্রয়োজন। কিন্তু তারা তাদের প্রয়োজনের জন্য কথা বলতে পারে না, বক্তৃতা ও মিছিল করতে পারে না। তাই তাদের প্রয়োজন ও চাহিদা বুদ্ধিমান মানুষকে বুঝতে হবে। পৃথিবীতে এমন কোনো সভ্য জাতি আসেনি যারা মানুষের সুখ-শান্তি নিশ্চিত করে জীবজন্তুর সুখ-শান্তিও নিশ্চিত করেছে। কোনো কোনো সমাজে পশুর নির্যাতনের বিরুদ্ধে কিছু আইন থাকলেও তা পশুর শান্তিপূর্ণ জীবনের জন্য যথেষ্ট নয়। ইসলাম বিশ্ব স্রষ্টা আল্লাহর বিধান তাই সৃষ্টির সকলের সুখ-শান্তির বিধান এর মধ্যে রয়েছে। পশুদেরকে মহান আল্লাহ মানুষের খেদমত ও কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন। মানুষ পশু থেকে তার প্রয়োজনীয় সকল খেদমত গ্রহণ করবে যেমন বাহন হিসাবে ব্যবহার করা, মাল বহন করা, চাষাবাদ করা, যুদ্ধে ব্যবহার করা, দুধপান করা, গোশত খাওয়া, চামড়া ও হাড্ডি ব্যবহার করা ইত্যাদি। কিন্তু পশুদের প্রতি মানুষের অনেক দায়িত্ব আছে যা একটি মুহূর্তের জন্যও অবহেলা করার মতো নয়।

আল কুরআনের বহুস্থানে পশু সম্পর্কে এবং তাদের উপকারিতা সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। পশুকে আল্লাহ সৌন্দর্যের প্রতীক আখ্যায়িত করেছেন। 'তিনিই চতুষ্পদ জন্তুগুলোকে সৃষ্টি করেছেন। তার মধ্যে তোমাদের জন্য শীতের কম্বলও রয়েছে, আরও বহু উপকারিতা রয়েছে, এবং এগুলোর মধ্যে হতে তোমরা ভক্ষণও করে থাক। আর সেগুলোতে তোমাদের জন্য সৌন্দর্যও রয়েছে– যখন গোধূলীলগ্নে তাদেরকে চারণভূমি থেকে গৃহে আনয়ন কর আর যখন প্রভাতে তাদেরকে চারণভূমিতে নিয়ে যাও। এরা তোমাদের বোঝা এমন দূরদেশে বহন করে নিয়ে যায় যেখানে তোমরা প্রাণান্ত ক্লেশ ছাড়া পৌছাতে পারতে না। বাস্তবিক তোমাদের রব অত্যন্ত কৃপাবান, দায়িত্বশীল। তিনি সৃষ্টি করেছেন ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা, যেন তোমরা এর উপর আরোহন করতে পার এবং শোভার জন্যও। তিনি এরূপ বহু বস্তু সৃষ্টি করেন যার সম্পর্কে তোমরা খবরও রাখ না।'

(সূরা নাহাল-৫-৮)

'এরা কি লক্ষ্য করে না যে, আমি তাদের জন্য আমার বস্তুসমূহের মধ্যে নিজ হাতে চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছি। অতপর এরা এ সকল পশুর মালিক হয়েছে। আমি যে সকল চতুষ্পদ জন্তুকে তাদের বশীভূত করে দিয়েছি এদের কতক তাদের বাহন, আর কতক

লেখক : প্রাবন্ধিক, রাজনীতিক ও সংগঠক।

তারা আহার করে। আর তাদের জন্য এগুলোতে আরও অনেক উপকার রয়েছে আর আছে পানীয় দ্রব্যাদি। তবুও কি তারা শোকর করবে না?' (সূরা ইয়াসিন-৭১-৭৩)

আল কুরআনে পশু সম্পর্কে অনেক আয়াত রয়েছে। এ সকল আয়াত থেকে দুটো বিধান নির্ধারিত হয়েছে,

১. যে সব পশুর মালিক মানুষ কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এর মালিক মহান আল্লাহ। তিনি এগুলো সৃষ্টি করে মানুষের অধীন করে দিয়েছেন। যদি আল্লাহ এগুলোকে মানুষের অধীন করে না দিতেন তাহলে মানুষের কি ক্ষমতা ছিল তার চেয়ে বড় ও শক্তিশালী পশুগুলোকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখার? এটা শুধু মানুষের প্রতি মহান আল্লাহর মেহেরবানি। যেভাবে আল্লাহ পশুগুলোকে মানুষের অধীন করে দিয়েছেন ঠিক তেমনিভাবে মানুষ অধীনস্ত পশুর সাথে সে রকম ব্যবহার করবে যেমন আমানতদার তার আমানত রক্ষা করে। রসূল স. বাহনের উপর সওয়ার হওয়ার সময় নিম্নের দোয়া পড়ার জন্য বলেছেন- "সুবহানাল্লাযী সাখ্খারা লানা হাযা ওমা কুন্নালাহু মুকরিনীন"

২. পশু আল্লাহর সৃষ্ট জীব অতএব জীব হিসেবে মানুষ ও পশুর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। মানুষের মত তাদেরও আছে অধিকার।

মহান আল্লাহ বলেন, ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল এমন জীব নেই অথবা নিজ ডানার সাহায্যে এমন কোনো পাখী ওড়ে না কিন্তু এরা তোমাদের মত এক একটি উম্মত।' (সূরা আনআম-৩৮) একবার হযরত উবায়দুল্লাহ হযরত আবদুল্লাহ ইবন বশিরের খেদমতে এসে জিজ্ঞেস করলেন যে, এক ব্যক্তি ঘোড়ার পিঠে আরোহন করে ঘোড়াকে চাবুক মারে, এ সম্পর্কে রসূল স. এর কোন নির্দেশনা আছে কি ? তিনি কোনো জবাব দিলেন না। পর্দার আড়াল থেকে একজন মহিলা জবাব দিলেন, মহান আল্লাহ নিজেই বলেছেন- মানুষ মানুষের সাথে যেমন ভালো আচরণ করে পশুর প্রতিও তেমনি ভালো আচরণ করবে। হুজুর স. বলেছেন- "যদি কুকুর উম্মতের মধ্যে একটি উম্মত না হত তাহলে আমি তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিতাম।

ইসলামে বিনা কারণে কুকুর পর্যন্ত হত্যা করা বৈধ নয়, কেন না ওরাও আল্লাহর সৃষ্ট। রসূল স. বলেছেন, এক ব্যক্তি পিপাসার্ত কুকুরকে পানি পান করাবার কারণে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

এক ব্যক্তি নবী করীম স.কে বললেন, হে আল্লাহর রসূল স. পশুর সাথে ভালো ব্যবহার করলে তার কোনো প্রতিদান ও সওয়াব আছে কি? নবীজী স.বললেন, প্রত্যেক জীবের সাথে ভালো ব্যবহার করার মধ্যে সওয়াব আছে।

বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম মহামানব সমগ্র সৃষ্টির প্রতি দয়ালু নবী মুহাম্মদ স. পশুদের জন্য বিধিবিধান প্রণয়ন করে গেছেন যা পৃথিবীর সকল মানুষের নিকট সমানভাবে গ্রহণীয়। যা চলতে থাকবে অনন্তকাল ধরে।

পশুকে অপ্রয়োজনীয় ও অধিক পরিশ্রম না করানো

পশুকে অপ্রয়োজনীয় এবং অস্বাভাবিক পরিশ্রমের কাজে নিয়োগ করতে আল্লাহর রসূল নিষেধ করেছেন। যে পশুকে যে কাজের জন্য আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন সে পশুকে সে কাজে ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ উট সৃষ্টি করেছেন এ জন্য যে, তোমরা যেখানে সহজে পৌঁছতে না পার সেখানে সে তোমাদেরকে সহজভাবে পৌঁছে দেয়। অতএব বিনা প্রয়োজনে তাদের পিঠে বসে থেকো না। তাদের পিঠ পাথর নয় কাঠ নয় যে, যা ইচ্ছা তাই বোঝা চাপাবে। পশুকে কাজে ব্যবহার করার সময় তার প্রতি দয়ার দৃষ্টি রাখবে।

পশুর জন্য খাদ্য ও বিশ্রামের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ

পশুর বাক শক্তি নেই তাই তারা মালিকের নিকট তাদের প্রয়োজন, সমস্যা ও চাহিদার কথা বলতে পারে না। তাই অন্তর দিয়ে মালিককে তার অধীনস্থ পশুগুলোর সুবিধা অসুবিধাগুলো বুঝার চেষ্টা করতে হবে এবং আন্তরিকতার সাথে তা সমাধান করার চেষ্টা করতে হবে। তার খাদ্য মানসম্মত হতে হবে এবং মৌসুম অনুযায়ী তার থাকার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে সে আরাম বোধ করে। অসুস্থ হলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

রসূল স. বলেছেন, তোমরা বাকহীন পশুর সাথে ব্যবহারের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। সুস্থ ও ভালো অবস্থায় তার পিঠে আরোহণ কর। (আবু দাউদ) তাকে কোন রকম কষ্ট দিলে, বেশি ও কঠোর পরিশ্রম করালে, খাদ্যের প্রতি যত্ন না নিলে, মারধর করলে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। একজন আনসারী তার উটকে বেশি বেশি খাটাতো কিন্তু তার যত্ন, খাদ্য ও আরাম আয়েশের ব্যাপারে অবহেলা প্রদর্শন করত। রসূল স. তাকে ডেকে গুরুত্ব সহকারে বললেন, এ জন্তুর ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাকে তুমি কি ভয় করো না ? অথচ তিনি তার রহমত দ্বারা পশুগুলোকে তোমার অধীন করে দিয়েছেন। তুমি এর থেকে কাজ বেশি নাও অথচ তাকে অভুক্ত রাখ।

উল্লেখিত হাদীসের গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে ওলামায়ে কেরাম অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, পরিশ্রমের পরে নিজের খাবার ও বিশ্রামের পূর্বে পশুর খাবার ও আরামের ব্যবস্থা করা খুবই জরুরী।

পশুর মুখে মারা ও দাগ দেয়া নিষেধ

পশুকে প্রয়োজন মোতাবেক শাস্তি দেয়া যাবে। কিন্তু পশুর মুখের উপর আঘাত করা ও দাগ দিতে রসূল স. নিষেধ করেছেন। এরূপ ব্যক্তির প্রতি রসূল স. লানত করেছেন।

দুই পশুর মধ্যে লড়াই করানো নিষেধ করা হয়েছে।

'দুই পশুর মধ্যে লড়াই করাতে রসূল স. নিষেধ করেছেন।' (আবু দাউদ)

এতে পশুর কষ্ট হয় এবং অনেক সময় পরাজিত পশু মারা যায়।

পশুর প্রতি লানত বর্ষণ করা নিষেধ

মানুষকে যেভাবে গালি দেয়া, লানত করা নিষেধ তেমনিভাবে পশুকে গালি দেয়া ও লানত করা নিষেধ। একবার রসূল স. শুনতে পেলেন কে যেন একটি পশুকে লানত

করছে। রসূল স. জিজ্ঞেস করলেন কে পশুকে লানত করেছে? লোকেরা বলল, একজন মহিলা তাকে বহনকারী পশুকে লানত করছে, নবীজী স. শুনে বললেন, বাহনের উপর থেকে হাওদা নামিয়ে দাও, সে তো নিজেই লানতের কাজ করেছে।

কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইমামগণ ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালকদের জন্য পশুর ব্যাপারে কয়েকটি নীতিমালা বর্ণনা করেছেন।

হযরত আবু হানিফা র. বলেছেন, রাষ্ট্রের ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিবিধানের মধ্যে মালিককে পশুর খাদ্যের ব্যবস্থা করা, পশুর আরামের ব্যবস্থা গ্রহণ ও জুলুম না করার নির্দেশ জারী করাও জরুরী।

ইমাম মালেক র. ইমাম শাফেয়ী র. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল র. এর সম্মিলিত মত হচ্ছে–

রাষ্ট্রের পরিচালক পশুর মালিককে বাধ্য করবেন, হয় পশুকে যথাযথ খাদ্য প্রদান করবে নয়তো তাকে বিক্রি করে দিবে।

ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ র. এর অভিমত হলো, যদি কেউ পশুর সাধ্যের অতিরিক্ত কাজ নেয় অথবা তার ওপর বোঝা চাপায় তাহলে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ তাকে বিরত রাখবে। (ইসলামের খেটে খাওয়া মানুষের আইন)

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। এর মধ্যে মানুষের দোলনা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এবং কবরের জীবন থেকে হাশরের জীবন তারপর জান্নাত ও জাহান্নাম আসমান ও জমিন, তার মধ্যে যা কিছু আছে সকল বিষয় ইসলামের নিকট সুস্পষ্ট রয়েছে। তাই পশুর বিষয়টিও বাকী রাখা হয় নি। পশুর অধিকার আদায় ও পশুর খাদ্যের ব্যবস্থা গ্রহণ, বাসস্থান ও আরাম আয়েশের বিষয়টি ইসলামি আইনে গুরুত্ব লাভ করেছে এবং রসূল স. পশুর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করতে বলেছেন। পশুর অধিকার ও যত্নের ব্যাপারে যদি এত তাকিদ প্রদান করা হয়ে থাকে তাহলে অধীনস্থ শ্রমজীবী মানুষের অধিকারের বিষয়টি কত গুরুত্বপূর্ণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আজকের বিশ্বে শ্রমজীবী মানুষ অবহেলিত, ঘৃণিত, লাঞ্ছিত, অত্যাচারিত, নিপীড়িত ও নির্যাতিত। শ্রমজীবী মানুষ যদি তাদের অধিকার লাভ করতে চায় তাহলে ইসলামী বিধানের কাছে তাদের ফিরে আসতে হবে। অন্যথায় মানব রচিত বিধান শ্রমজীবী মানুষের শোষণের হাতিয়ার। ইসলাম যদি পশুর জীবনের শান্তি নিশ্চিত করতে পারে তাহলে শ্রমজীবী মানুষের জীবনের সুখ শান্তি কি নিশ্চিত করতে পারবে না ? যারা বলে ইসলাম শ্রমজীবী মানুষের অধিকার নিশ্চিত করতে পারে নি তারা আসলে ইসলামের দুশমন এবং শ্রমজীবী মানুষেরও দুশমন। তারা শ্রমজীবী মানুষকে বিভ্রান্ত করে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌছাতে চায়। যে ইসলাম পশুর অধিকার দেয় পরিপূর্ণভাবে সে ইসলামই শ্রমজীবী মানুষের অধিকার একশত ভাগই নিশ্চিত করেছে এবং তারই মধ্যে রয়েছে শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির পথ।

মুসলিম পার্সোনাল ল' এর শরীয়ত বিরোধী ধারাগুলো সংশোধন

মুফতী ও বিশেষজ্ঞ আলেমগণের অভিমত

আইন ও বিচার প্রতিবেদন

৩ মার্চ ২০০৫ ঢাকাস্থ হামদর্দ মিলনায়তনে 'ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ' এবং 'দারুল ইফতা বাংলাদেশ' এর যৌথ উদ্যোগে ৬১ সনের আইউব খান প্রবর্তিত 'মুসলিম পারিবারিক আইনে' কুরআন সুন্নাহ পরিপন্থী ধারা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ উলামা ও মুফতীদের একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় সভাপতিত্ব করেন, জাতীয় শরীয়া কাউন্সিলের চেয়ারম্যান এবং বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতীব মাওলানা উবায়দুল হক। স্বাগত বক্তব্য রাখেন, মাওলানা আবদুস সুবহান এম.পি, সভাপতি, সরকারী প্রতিশ্রুতি সম্পর্কীয় সংসদীয় কমিটি। মতামত পেশ করেন সাবেক মন্ত্রী ও প্রবীণ রাজনীতিক মাওলানা একেএম ইউসুফ, সাবেক এম.পি মাওলানা আতাউর রহমান খান, জাতীয় শরীয়া কাউন্সিলের জেনারেল সেক্রেটারী মুফতী সাঈদ আহমদ, মাদরাসা আলীয়া ঢাকা এর সাবেক প্রিন্সিপাল মাওলানা নূর মুহাম্মদ, প্রবীণ আইনজীবী ও বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. হাফেজ এবিএম হিজবুল্লাহ, অধ্যাপক ড. এইচ এম হাসান মঈনুদ্দীন বিভাগীয় প্রধান ইসলামিক স্টাডিজ ও দাওয়া বিভাগ দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা, বিশিষ্ট আলেম ও ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা একিউএম ছিফাতুল্লাহ, বিশিষ্ট গবেষক মুফতী কামাল উদ্দীন রাশেদী, মুফতী জামেয়া মাদানিয়া আরাবিয়া যাত্রাবাড়ী ঢাকা, মুফতী মাওলানা আবু ইউসুফ, ভাইস প্রিন্সিপাল তামিরুল মিল্লাত মাদরাসা, ঢাকা, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী, বিশিষ্ট আলেম মাওলানা আবদুর রাজ্জাক নদভী, ইসলামী চিন্তাবিদ ও লেখক ইঞ্জিনিয়ার বি.এ মাহমুদ, মাওলানা বজলুর রহমান প্রমুখ।

মাওলানা বজলুর রহমানের কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে মতবিনিময় সভা শুরু হয়। ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ এর চেয়ারম্যান মাওলানা আবদুস সুবহান এম.পি স্বাগত ভাষণে বলেন, মুসলিম পারিবারিক আইনের সংশোধন কল্পে অর্থবহ কাজ করার উদ্দেশ্যেই আমাদের আজকের মতবিনিময় বৈঠক। ইংরেজরা ১৯০ বছর এ দেশ শাসন করলেও মুসলিম পারিবারিক আইনে কোন হস্তক্ষেপ করেনি। তারা মুসলমানদের পার্সোনাল ল' অবিকৃত রেখেছিল। কিন্তু ১৯৬১ সালে তৎকালীন পাকিস্তানী সামরিক শাসক আইয়ুব খান জাতির ঘাড়ে ইসলাম পরিপন্থী আইন চাপিয়ে দেয়। স্বাধীন বাংলাদেশে তিন যুগ ধরে আজো আমরা সেই চাপিয়ে দেয়া আইন বয়ে বেড়াচ্ছি। তিনি বলেন, সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার বিয়ে রেজিষ্ট্রি আইনে কতিপয় সংশোধনী এনেছে, তাতে বিবাহ ব্যবস্থাকে আরো জটিল করে ব্যভিচারের পথ সুগম করা হয়েছে। তিনি সরকারের প্রতি কুরআন সুন্নাহ অনুযায়ী আইউবী আইন সংশোধন করার দাবী জানান। মাওলানা আবদুস সুবহান বলেন, যে দেশের ৯০ শতাংশ মানুষ মুসলমান সে দেশে যুগের পর যুগ ইসলাম বিরোধী আইন চলতে দেয়া যায় না।

তিনি বলেন, 'ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার' বাংলাদেশে ইসলামি আইন প্রবর্তন ও প্রণয়নের জন্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সকল স্তরের চিন্তাবিদ, গবেষক, আলেম, ফকীহ ও আইনবিদের ধর্মীয় দায়িত্ব হলো একে সহযোগিতা করা।

* মাওলানা একেএম ইউসুফ বলেন, মুসলিম পারিবারিক আইনের ৩ নম্বর ধারাটি সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী। অনুরূপ ৪ নম্বর ধারাতে মীরাস সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক। তদ্রূপ ৬ নম্বর ধারাতে একাধিক বিয়ের ব্যাপারে যা বলা হয়েছে তাও কুরআন সুন্নাহর পরিপন্থী। ৭ নং ধারা মতে চেয়ারম্যানের ইচ্ছার সাথে তালাক কার্যকর হওয়াকে শর্তযুক্ত করা হয়েছে, যা একেবারেই শরীয়ত সম্মত নয়। এ সব আইনের কারণে প্রচলিত আইনে মুসলমানরা অবৈধ জীবন যাপনে বাধ্য হচ্ছে এবং সেই সাথে ইসলাম পরিপন্থী বিচারেরও শিকার হচ্ছে, যা কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না। অথচ ভারতের মতো হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি দেশেও মুসলিম পার্সোনাল ল'কে যথাযথভাবে সম্মান দেয়া হয়েছে। ভারতের কোন সরকার মুসলিম পার্সোনাল ল'তে কোন ধরনের হস্ত ক্ষেপ করেনি। অথচ এদেশে আমরা ৯০ শতাংশ মুসলমান হয়েও আমাদের পারিবারিক ইসলামী বিধানগুলো পর্যন্ত অবিকৃত রাখতে পারিনি।

* মাওলানা আতাউর রহমান খান বলেন, মুসলিম পারিবারিক আইন নামে যে আইনটি আছে এ আইনকে অনেক ইংরেজি শিক্ষিত মন্ত্রী, এমপিরা পর্যন্ত মনে করেন ইসলামী আইন। কাজেই এটিতে সংশোধনী আনাকে তারা ইসলামী আইনের উপর আঘাত হানা ভেবে কঠোর বিরোধিতা করার মতো ঘটনাও দেখা গেছে। এ দেশে সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, অধিকাংশ মানুষ এ আইনটি যে ইসলাম পরিপন্থী তা জানে না। তাদেরকে এ আইনের বাস্তব জ্ঞান দিতে হবে। তিনি বলেন, এ জন্য আমাদের এক পাশে বর্তমান প্রচলিত আইন এবং অন্য পাশে ইসলামী আইনকে রেখে পুস্তিকা প্রকাশ করতে হবে। যে সব ঘাটতি ও সমস্যার মুখোমুখি হয়ে আইয়ুব খান সরকার এই আইন সংস্কারের নামে অনৈসলামিক আইন প্রবর্তন করেছেন সেসব সমস্যা ও প্রশ্নের শরীয়ত সম্মত সুরাহা করতে হবে। মীরাস বঞ্চিতদের জন্যে ইসলামের বিকল্প পথ 'হেবা', 'ওসীয়ত' ইত্যাদির ব্যাপারে জোরালো আইন করা যেতে পারে। তালাক, ইদ্দত ইত্যাকার সমস্যাবলীর জন্যে ইসলামী পারিবারিক আদালত প্রতিষ্ঠার বিষয়গুলোকে সক্রিয় করার কথা ভাবা যেতে পারে। মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির জন্যে ব্যাপক প্রচারাভিযান চালাতে হবে। রাস্তার আন্দোলন না করে পলিসি মেকার ও নীতিনির্ধারক মহলের সাথে বৈঠক, আলাপ আলোচনা করে তাদের অবহিত করতে হবে। চূড়ান্ত পর্যায়ে আইনের সংশোধিত খসড়া তৈরি করে তা সংশোধনের জন্য পার্লামেন্টে পেশ করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

* ড. প্রফেসর হাফেজ এ বিএম হিযবুল্লাহ বলেন, সৌদী আরব নাতিনাতনীর মীরাস বঞ্চিত হওয়ার ব্যাপারটি সমাধানের জন্যে 'ওয়াসিয়্যাতুল ওয়াজিবা' নামে একটি নতুন ধারার প্রবর্তন করেছে। তিনি বলেন, একাধিক বিয়ের ব্যাপারে আইনী বিধি নিষেধ আরোপ করে ব্যভিচারকে উৎসাহিত করা হয়েছে। প্রকারান্তরে ব্যভিচারকে আইনী সহায়তা দান করা হয়েছে। তিনি বলেন, তালাক কার্যকর হওয়ার জন্য চেয়ারম্যানের সম্মতিকে শর্তযুক্ত না করে চেয়ারম্যানের সাথে তালাকপূর্ব আলোচনা ও সালিশের শর্তারোপ করা যেতে পারে।

* প্রফেসর নূর মোহাম্মদ (সাবেক অধ্যক্ষ মাদ্রাসা ই আলীয়া ঢাকা) বলেন, মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১সহ সকল অনৈসলামিক আইন বাতিলের আন্দোলনে আলেমগণকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

* বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও শিল্পপতি বিএ মাহমুদ বলেন–

১. মুসলিম পার্সোনাল ল' সংশোধনের জন্য আমাদের মিডিয়াকে কাজে লাগাতে হবে।

২. চিঠিপত্রের কলাম, মতামত, বিভিন্ন পত্রিকার ইসলামী পাতায় এ বিষয়ে কলাম লিখতে হবে।

৩. আলেমদেরকে অন্তত এ ইস্যুতে ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।

৪. মসজিদের ইমাম ও আলেমদের ওয়াজ বক্তৃতায় এসব বিষয়ে আলোচনা করার পরিবেশ তৈরি করতে হবে।

* উবায়দুর রহমান খান নদভী অন্যান্য বক্তাদের মত সমর্থনপূর্বক intellectual তথা বুদ্ধি বৃত্তিক কমিটি গঠন ও নীরবে কাজ এগিয়ে নেয়ার উপর জোর দেন।

* মুফতী কামাল উদ্দীন রাশেদী বলেন, আমরা আজ যে বিষয়টি নিয়ে বৈঠকে বসেছি এটি রাজনৈতিক মঞ্চে বক্তৃতার বিষয় নয়। এর জন্যে অভিজ্ঞ ফকীহ ও অভিজ্ঞ আইনবিদদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করতে হবে। তারা প্রচলিত আইন ও ইসলামী আইন পর্যালোচনা করে একটা সমাধান মূলক খসড়া তৈরি করবেন। সেই খসড়া নিয়ে পরবর্তীতে আরো ব্যাপক পরিসরে মতবিনিময় বৈঠক করা যেতে পারে।

* মাওলানা আবদুর রাজ্জাক নদভী বলেন, মানুষের মধ্যে গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য আমরা এ সম্পর্কে সহজবোধ্য পুস্তিকা প্রণয়ন করে মসজিদের ইমামদের দিতে পারি। তারা যাতে এ বিষয়ে মুসল্লীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করেন। তিনি বলেন, প্রচলিত আইন ও ইসলামী আইনের ভিত্তিতে গবেষণা করে এর ঘাটতি স্বার্থ সমস্যা ও সমাধান বের করার জন্যে একটি গবেষক দল তৈরি করতে হবে, যারা ভবিষ্যতে ইসলামী ও পাশ্চাত্য আইনের মধ্যে সৃষ্ট বিরোধ দক্ষতার সাথে মোকাবেলা করবে। এসব পরিকল্পনা বাস্ত বায়নে একটি সাব কমিটি গঠন করে এসব কার্যক্রম শুরু করতে হবে।

* মাওলানা আবু ইউসুফ বলেন, আমাদের প্রতিপক্ষ খুবই দক্ষ ও সচেতন কিন্তু আমরা একেবারেই নিজেদের অধিকার ও ঐতিহ্য সম্পর্কে অজ্ঞাত। এখনও আমাদের সময় আছে মূর্খতা দূর করে নিজেদের ঈমানী অধিকার সংরক্ষণে পদক্ষেপ নেয়ার। এ ব্যাপারে আর সময় ক্ষেপন করা যাবে না।

*. ড. হাসান মঈনুদ্দীন বলেন, পারিবারিক মুসলিম আইনের সংশোধন কল্পে খসড়া তৈরির জন্যে একটি এক্সপার্ট কমিটি গঠন করতে হবে। যে কমিটিতে ফকীহ, রাজনীতিক, সমাজবিদ, সাংসদ ও আইনবিদ থাকবে। ফিকাহর পুরাতন কিতাবাদীকে নতুন করে বিন্যস্ত করতে হবে। যুগ সমস্যার সমাধানগুলোকে পুস্তক আকারে প্রকাশ ও বিলি করতে হবে।

* মাওলানা এ কিউ এম ছিফাতুল্লাহ বলেন, মুসলিম পার্সোনাল ল' নামে আমাদের দেশে যা চালু রয়েছে তা ঈমান পরিপন্থী। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা ধ্বংসের জন্য এই আইনটিই যথেষ্ট। এই ইসলাম বিরোধী আইন সংশোধনে আমাদের সম্ভাব্য করণীয় সব কিছুই করতে হবে।

* মুফতী সাঈদ আহমদ বলেন, ইসলাম অত্যাধুনিক ও সকল যুগ জিজ্ঞসা ও সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম। যে সব সমস্যাকে কেন্দ্র করে মুসলিম পারিবারিক আইনে অনৈসলামিক ধারা সংযোজিত হয়েছে এ সবের বাস্তব সমাধান ইসলামে রয়েছে, যেগুলো প্রচলিত আইনের চেয়ে আরো বেশি কল্যাণকর ও ব্যাপক। আমাদের এসব বিষয় জনগণের সামনে তুলে ধরতে হবে।

* মত বিনিময় সভার উপস্থাপক ও আহ্বায়ক এবং ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড-এর জেনারেল সেক্রেটারি এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম বলেন, ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার দীর্ঘ দিন থেকে বাংলাদেশে ইসলামী আইন প্রবর্তনে প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে ইসলামী আইনের মূল উৎস কুরআন সুন্নাহ ইজমা ও কিয়াসের মাধ্যমে সকল সমস্যার সমাধানের মতো যুগ উপযোগী আইন তৈরির কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু অভিজ্ঞ ফকীহ এবং বিজ্ঞ আইনবিদদের এ ব্যাপারে উদাসীনতার কারণে কাজটি কাংখিত গতিতে অগ্রসর হচ্ছে না। তিনি এ কাজে সংশ্লিষ্ট সকল উলামা

মাশায়েখ ফকীহ ও বিজ্ঞ আইনবিদদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। সেই সাথে এ লক্ষকে সফল করার জন্য সকল মহলের সহযোগিতা কামনা করেন।

* সভাপতির ভাষণে মাওলানা উবায়দুল হক বলেন, আজকের মতামতের ভিত্তিতে আমরা এখনই একটি সাব কমিটি গঠন করতে চাই। এখন এ ব্যাপারে দীর্ঘ বক্তৃতার চেয়ে সতর্কতার সাথে কাজ করে যেতে হবে।

তিনি মুফতী সাঈদ আহমদকে সভাপতি ও এডভোকেট নজরুল ইসলামকে সদস্য সচিব করে ৭ সদস্যের একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করার প্রস্তাব করেন। উপস্থিত বিশেষজ্ঞদের সমর্থনে ৭ সদস্যের একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠিত হয়।

কমিটির সদস্যরা হলেন যথাক্রমে-

সভাপতি	:	মুফতী সাঈদ আহমদ
সদস্য সচিব	:	এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
সদস্য	:	ড. অধ্যাপক হাফেজ এবিএম হিযবুল্লাহ
"	:	ড. এইচ এম হাসান মঈনুদ্দীন
"	:	মুফতী মাওলানা আবু ইউসুফ
"	:	মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী
"	:	মুফতী আবুল হাসান মুহাম্মদ আবদুল্লাহ।

এই সাত সদস্যের বিশেষজ্ঞ কমিটি প্রচলিত মুসলিম পারিবারিক অধ্যাদেশে বর্ণিত ইসলামী শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক ধারাগুলোর মোকাবিলায় শরয়ী ধারা পুনস্থাপনের সুপারিশ সম্বলিত আইনের খসড়া তৈরি করবেন। আলোচনা শেষে সভাপতির মোনাজাতের মাধ্যমে বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মুসলিম পার্সোনাল ল' ১৯৬১ সংশোধনী প্রকল্পের কার্যক্রম

মুসলিম পার্সোনাল ল'-এর শরীয়ত বিরোধী ধারা সংশোধন কল্পে ৩ মার্চ ২০০৫ হামদর্দ মিলনায়তনে উলামা মাশায়েখ ও বিশেষজ্ঞদের মত বিনিময় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

৩ মার্চ ২০০৫ এর উক্ত বৈঠকে ৬১ সালের কুরআন বিরোধী ধারাগুলোর বিকল্প শরীয়ত অনুমোদিত ধারা তৈরির জন্য ৭ সদস্যের একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয় এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. মনজুরে ইলাহীকে এ কমিটিতে যুক্ত করা হয়।

সারা দেশের ১২০ টিরও বেশি সরকারী ও বেসরকারী বড় বড় মাদরাসা এবং বিশেষ প্রতিষ্ঠান প্রধান ও এক্সপার্টদের কাছে মত বিনিময় অনুষ্ঠানের রিপোর্ট বিশেষ ব্যবস্থায় পাঠানো হয়েছে।

দেশের বড় বড় মুফতী ও উলামায়ে কেরামদের কাছে শরীয়ত বিরোধী ধারার বিকল্প শরয়ী ধারা কি হতে পারে এ সম্পর্কে মতামত চেয়ে চিঠি দেয়া হয়েছে।

বিশেষজ্ঞ কমিটি তালাক, বহুবিবাহ, উত্তরাধিকার, খোরপোষ বিয়ের বয়স ও রেজিস্ট্রেশন, ইত্যাকার বিষয়ে শরীয়ত সমর্থিত ধারার খসড়া প্রণয়নের জন্য ইংরেজি ১১.০৩.০৫, ০১.০৪.০৫, ০৬.০৫.০৫, ২৭.০৫.০৫, ১৭.০৬.০৫ ও ০৮.০৭.০৫ তারিখে মোট ছয়টি বৈঠক করেছে। এর মধ্যে বয়স ও রেজিস্ট্রেশন, নাতিনাতনীদের উত্তরাধিকার, বহু বিবাহ সম্পর্কে তিনটি খসড়া চূড়ান্ত হয়েছে এবং এগুলো নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা হয়েছে। অপরাপর বিষয়ে প্রবন্ধ ও তথ্য সংযোজনের কাজ চলছে।

গ্রন্থনা : শহীদুল ইসলাম

লেনদেন সংক্রান্ত কুরআনের আইন

মু: শওকত আলী

১. 'পাত্র দ্বারা মাপ দিলে পুরোপুরি ভর্তি করে দিবে আর ওজন করে দিলে ক্রটিহীন পাল্লা দ্বারা ওজন করে দিবে। এটি খুবই ভালো নীতি, পরিমাপের দৃষ্টিতেও এটি খুব উত্তম।' (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ৩৫)

প্রবঞ্চনামূলক লেনদেন

১. 'ধ্বংস হীন ঠকবাজদের জন্য।

২. যাদের অবস্থা এই যে, লোকদের থেকে গ্রহণের সময় পুরোমাত্রায় গ্রহণ করে কিন্তু তাদেরকে যখন ওজন বা পরিমাপ করে দেয় তখন তাদের ক্ষতি সাধন করে।

৩. এই লোকেরা কি বুঝে না যে একটি মহা দিনে তাদের পুনরুত্থান ঘটানো হবে।'

(সূরা মুতাফফিফীন আয়াত ১-৫)

সূদ

সূদ নিষিদ্ধ

১. 'হে ঈমানদারগণ এই চক্রবৃদ্ধি হারে সূদ খাওয়া ত্যাগ করো এবং আল্লাহকে ভয় কর, আশা করা যায় যে, তোমরা কল্যাণ লাভ করবে।'

২. 'কিন্তু যারা সূদ খায় তাদের অবস্থা হয় সেই ব্যক্তির মত যাকে শয়তান তার স্পর্শ দ্বারা পাগল ও সুস্থজ্ঞান বিবর্জিত করে দিয়েছে। তাদের এরূপ অবস্থা হওয়ার কারণ এই যে তারা বলে ব্যবসা তো সূদের মতই জিনিস, অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন ও সূদকে করেছেন হারাম। কাজেই যে ব্যক্তির নিকট তার প্রভুর তরফ থেকে এ উপদেশ পৌছবে এবং ভবিষ্যতে এই সূদখোরী থেকে বিরত থাকবে সে পূর্বে যা কিছু খেয়েছে তা তো খেয়েছেই সেই ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর উপর সোপর্দ আর যারা নির্দেশ পাওয়ার পরও এর পুনরাবৃত্তি করবে তারা নিশ্চিতরূপে জাহান্নামী হবে, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।' (সূরা বাকারা ২৭৫)

লেখক : বোর্ড সেক্রেটারী, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি:, জয়েন্ট সেক্রেটারি ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এই বাংলাদেশ।

৩. 'আল্লাহ সূদকে নির্মূল করে দেন এবং দান খয়রাতকে ক্রমবৃদ্ধি দান করেন এবং আল্লাহ্ কোন অকৃতজ্ঞ ও পাপী মানুষকে পছন্দ করেন না।' (সূরা বাকারা ২৭৬)

৪. 'হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় কর আর তোমাদের যে সূদ লোকদের নিকট পাওনা রয়েছে তা ছেড়ে দাও। যদি বাস্তবিকই তোমরা ঈমান এনে থাকো।' (সূরা বাকারা ২৭৮)

৫. 'কিন্তু তোমরা যদি এরূপ না কর তবে জেনে রাখো যে আল্লাহ্ ও রসূলের পক্ষ থেকে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা রয়েছে। এখনও যদি তওবা কর তবে তোমরা মূলধন ফিরে পাওয়ার অধিকারী হবে। তোমরা জুলম করবে না, তোমাদের প্রতিও জুলম করা হবে না।' (সূরা বাকারা ২৭৯)

ঋণী

১. 'তোমাদের নিকট হতে ঋণ গ্রহণকারী ব্যক্তি যদি অভাবগ্রস্ত হয় তবে সচ্ছল হওয়া পর্যন্ত তাকে অবসর দাও। আর যদি সদকা করে দাও তবে তা তোমাদের পক্ষে অধিকতর কল্যাণকর হবে, যদি তোমরা বুঝতে পার।' (সূরা বাকারা ২৮০)

২. 'আর সে দিনের লাঞ্ছনা ও বিপদ হতে আত্মরক্ষা কর যেদিন তোমরা আল্লাহর দিকে ফিরে যাবে, সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার উপার্জিত পাপ কিংবা পূণ্যের পুরোপুরি ফল দান করা হবে এবং কখনই কারো উপর জুলুম করা হবে না।' (সূরা বাকারা ২৮১)

ইসলামী আইন ও বিচার-এর এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

❖ ৫ কপির কম এজেন্ট করা হয় না।

❖ বছরের যে কোনো সময় এজেন্ট হওয়া যাবে।

❖ পত্রিকার মূল্য অগ্রিম পাঠাতে হয় না। পোস্ট অফিস থেকে ভিপিপি প্যাকেট বুঝে নিয়ে টাকা পরিশোধ করতে হয়।

❖ এজেন্টগণকে প্রথমবারের মতো এজেন্সি ফি বাবদ ৫০.০০ (অফেরতযোগ্য) জমা দিতে হবে।

❖ ভিপিপিযোগে পত্রিকা পাঠানো হয়। ভিপিপি গ্রহণ না করে ফেরত পাঠালে পত্রিকা আর পাঠানো হবে না।

কমিশনের হার

৫-২০ কপি = ৩০% ২০ কপির বেশি হলে ৪০% কমিশন প্রদান করা হবে।

গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

❖ বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

❖ গ্রাহক চাঁদা মানি অর্ডার, ব্যাংক ড্রাফট অথবা সরাসরি জমা দিলে পত্রিকা পাঠানো হয়।

❖ রেজিস্ট্রি ডাক ছাড়া সাধারণ ডাকে পত্রিকা পাঠানো হয় না।

গ্রাহক চাঁদার হার

দেশ	ষান্মাষিক (২ সংখ্যা)	বার্ষিক (৪ সংখ্যা)
বাংলাদেশ	৭০ টাকা	১৪০ টাকা
পাকিস্তান, ভারত, নেপাল	২১০ টাকা	৪২০ টাকা
সউদী আরব, কুয়েত, ওমান, কাতার	২৮০ টাকা	৫৬০ টাকা
ইরান, ইরাকসহ এশীয় দেতশসমূহ	৩৫০ টাকা	৭০০ টাকা
ইউরোপ ও আফ্রিকার দেশসমূহ	৮০০ টাকা	১৬০০ টাকা
উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও ওশেনীয় মহাদেশের দেশসমূহ	৯০০ টাকা	১৮০০ টাকা

ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ
পিসি কালচার ভবন, ১৪ শ্যামলী, শ্যামলী বাসষ্ট্যান্ড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।
ফোন- ৯১৩১৭০৫, মোবাইল : ০১৭১-৩৪৫০৪২
E-mail :ilrclab@yahoo.com

ইসলামী আইন ও বিচার
গ্রাহক/এজেন্ট ফরম

আমি 'ইসলামী আইন ও বিচার' এর গ্রাহক / এজেন্ট হতে চাই

☐ আমার জন্য ☐ প্রতিষ্ঠানের জন্য ☐ বছরের জন্য ☐ কপি প্রতি সংখ্যা

নাম ....

পদবী ....

পেশা ....

প্রতিষ্ঠানের নাম ....

ঠিকানা...

.... ফোন/মোবাইলঃ..

গ্রাহক পত্রের সঙ্গে...টাকা নগদ/মানি অর্ডার করুন।

কথায় (...)।

স্বাক্ষর স্বাক্ষর

ম্যানেজার

৫ কপির কমে এজেন্ট করা হয় না, ৫ কপি থেকে ২০ কপি পর্যন্ত ৩০% কমিশন ২০ কপির উর্ধে ৪০% কমিশন

=> ১ বছরের জন্য গ্রাহক মূল্য-(চার সংখ্যা) =৩৫৪=১৪০/=

=> ২ বছরের জন্য গ্রাহক মূল্য-(আট সংখ্যা) =৩৫৮=২৮০-১০=২৭০/=

=> ৩ বছরের জন্য গ্রাহক মূল্য-(বার সংখ্যা =৩৫ ১২=৪২০-২০=৪০০/=

গ্রাহক ফরমটি পূরণ করে নিচের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

সম্পাদক

ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ

পিসি কালচার ভবন, ১৪ শ্যামলী, শ্যামলী বাসস্ট্যান্ড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।

ফোন- ৯১৩১৭০৫, মোবাইল : ০১৭১-৩৪৫০৪২

E-mail :ilrclab@yahoo.com